KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28/2 [illegible]
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title : অনুভব (ANUBHAB)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1 2/1-2 ?? 3/1-2 3/3-4 Puja Special	Year of Publication : Oct 1977 [illegible] Oct 1978 May 1979 Sep 1979
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks

C.D. Rod No. : KLMLGK

শারদীয়া

অনুভব

সম্পাদক

তুলসী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় নয়

সরাসরি সব কবিতা-লেখকের কাছে পেঁছুতে পারিনি। কিন্তু পেঁছুতে চাই নির্ভুলভাবে। ইচ্ছে হয়, একবার, অন্তত একবার একশো ফর্মার এক দুরন্ত ছাউনির নীচে আমরা সব কবিতা-লেখক দাঁড়িয়ে পড়ি পাশাপাশি। ইচ্ছে হয়। কিন্তু পাঁচ ছয় ফর্মায় পেঁছুতে না পেঁছুতেই পড়ে যাই মুখ থুবড়ে। অতএব অপেক্ষা ছাড়া আর কীই বা করতে পারি! অপেক্ষা এবং অপেক্ষা…

কবিতা-লেখক মাত্রেই **অনুভবে**র আত্মীয়। আত্মীয় এবং বন্ধু। সহযোগী এবং সহযোদ্ধা। ডাকবাহী একটি কবিতা এলে মনে হয় আমাদেরই এক সহযোদ্ধা হাতে হাত মেলালেন আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে জড়িয়ে ধরি দুবাহু বাড়িয়ে।

অনুভবমাত্রেই কবিতা নয়। কিন্তু কবিতা মাত্রেই অনুভব—হৃৎপিণ্ডের রক্তমাখা অমল অনুভব। আমরা সেই অনুভব-আক্রান্ত কবিতা চাই। কবিতা পাঠান।

সরকার বাহাদুর আমাদের জন্য **অনুভব** নামটি অনুমোদন করলেন না। আগামী সংখ্যা থেকে পত্রিকার নাম হচ্ছে **অনুভব কবিতাপত্র**।

তুষার রায় চলে গেলেন। বড় নিদারুণ এই চলে যাওয়া। তারো আগে গেছেন যোগব্রত চক্রবর্তী, বিমল রায়চৌধুরী এবং শংকর চট্টোপাধ্যায়। এ কি মৃত্যু? না প্রতিবাদ? নষ্টা পৃথিবীর উপর রাগ এবং ঘৃণার প্রতিবাদ? বাংলা কবিতার আজ বড় দুঃসময়। হতভাগ্য আমরা!

অনুভব

ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা

১ম বর্ষ * নবপর্যায় * শারদীয় ১৩৮৪ * অক্টোবর ১৯৭৭

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শুভাপ্রসন্ন

সম্পাদক ঃ তুলসী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক তুলসী মুখোপাধ্যায় ৩০ বি আর. এন. দাস রোড, কলিকাতা-৩১ থেকে প্রকাশিত এবং হরিপদ পাত্র কর্তৃক ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা-৬ সত্যনারায়ণ প্রেস হইতে মুদ্রিত।

শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত কবিতা

একজন কবির সমগ্র মানসতাকে নির্বাচিত কিছু কবিতার মধ্যে ধরে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই বিভাগ-পরিকল্পনা। কবি শঙ্খ ঘোষের এ যাবৎ প্রকাশিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে মোট আটটি কবিতা এখানে চয়ন করে দেওয়া হল। সংবেদী, সজাগ কাব্যপাঠক এর মধ্য দিয়ে কবির সৃষ্টিশীল অন্তরসত্তাকে ছুঁয়ে যেতে পারবেন, এই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।

অলস জল

পা-ডোবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে ?
কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা ?

খুব মনে নেই আকাশ-বাতাস ঠিক কতটা বাংলাদেশের
কতটা তার মিথ্যে ছিল বুকের ভিতর বানিয়ে-তোলা ঃ

নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে
ঘনবিন্যুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে।

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম ? মাঝি, আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই

শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাও নি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই

স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিই নি কেন রাত্রিবেলা ?

উদাসীনা

পা ছুঁয়ে যে প্রণাম করি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান ?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
নির্জীব পা সরিয়ে নাও কিনা।

দুঃখ এতো ঝরাই, সে কি জানতে চেয়ে দেবদূতেরা কী চান ?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
তোমার মুখে সত্যিকারের ঘৃণা।

এখন আমি বুঝতে পারি আমায় নিয়ে কী চাও তুমি।
দুপুর জ্বালার মধ্যখানে
সূত্রপাতে অবসানে
তুমি আমায় দেখতে চেয়েছিলে
দু-হাত ধরেও থাকব উদাসীনা।

ভূমধ্যসাগর

আমাদের দেখা হল আচম্বিতে
অধিকন্তু শীতে
পশ্চিমপ্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী
দুই প্রান্ত থেকে ফিরে আমাদের দেখা হল ভূমধ্যসাগরে।
হাতে হাত তুলে নিই, তুমি প্লোতে কেঁপে ওঠো, বলো
'একী
কী সাজে সেজেছ নেশাতুর
তোমারও দু-হাতে কেন কলংকরেখার উচ্ছলতা
দেখো কত দীন হয়ে গেছ
সমস্ত শরীর জুড়ে বিসর্পিণী অত্যাচার অপব্যয় ছন্নছাড়া ভয়
এ তো নয় যাকে আমি রচনা করেছি স্তব্ধ রাতে
কেন তুমি এলে
আমাদের দেখা হল এ-কোন্ শীতার্ত পাংশু পটে
পশ্চিমবিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহরী।'

ঠিক, সব জানি
আমরা অনেকদিন মুখোমুখি বসি নি সহজে।
তোমার শ্যামল মুখে আজও আছে সজীব সঞ্চার
পটভূমিকায় ওড়ে সমুদ্রের আন্তরিক হাওয়া
আমি ভ্রুণ উপদ্রব নিয়ে ফিরি মেরুদণ্ড ঘিরে
এমন-কি সমুদ্রে ফেলি ছিপ

কিন্তু তবু
ছেড়ে দাও হাত, শুধু দেখো এই নীলাভ তর্জনী
ভূমধ্যসাগর
পুব বা পশ্চিম নয়, দেখো ওই দক্ষিণ জগৎ
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জ্ব'লে ওঠে দূর বন্য অন্তরাল ভেঙে।
তাই এইখানে নেমে আমাকে প্রণত হতে হয়
আমারও চোখের জলে ভ'রে যায় অরুণা ধরণী
দু-হাতে কলঙ্ক বটে, তবু
আমারই শরীর ভেঙে জেগে ওঠে ভবিতব্য দেশ
মৃত্যুর ঝমকে আর ঝোপে ঝোপে দিব্য প্রহরণে।
কলঙ্কে রেখো না কোনো ভয়
এমন কলঙ্ক নেই যা এই দাহের চেয়ে বড়ো
এমন আগুন নেই যা আরো দেহের শুদ্ধি জানে
তুমি আমি কেউ নই, শুধু মুহূর্তের নির্বাসন
আমাদের ফিরে যেতে হয় বারে বারে
দেশে দেশে ফিরে ফিরে ঘুরে যেতে হয়
পরস্পর অঞ্জলিতে রাখি যত উদাত্ত প্রণয়
সে তো শুধু জলাঞ্জলি নয়, তারই বীজে
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জেগে ওঠে আমাদের ভেঙে
তাই এইখানে নেমে আমাদের দেখা হল সমুদ্রের পর্যটক তটে।

ধূপের মতন দীর্ঘ উড়ে যায় মেঘাচ্ছন্ন দিন
তোমারও শরীর আজ মিলে যায় সমুদ্রের রঙে
আমাদের দেখা হয় আচম্বিতে ভূমধ্যসাগরে।
কখনো মসৃণ নয় দেখো আমাদের ভালোবাসা
তোমাকে কতটা জানি তুমি-বা আমাকে কত জানো
তাই আমাদের ভালোবাসা
প্রতিহত হতে হতে বেঁচে থাকে দিনানুদিনের দগ্ধ পাপে
আমি যদি নষ্ট হই তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত
তোমার ক্ষমার সজীবতা

আমার সত্তার আরো দীপ্য করে দেশ দেশান্তরে
আর মধ্যজলে
চোখে চোখে জ্ব'লে ওঠে ঘোর কৃষ্ণ বিস্ফারিত সসাগরা তৃতীয় ভুবন।
ফেরার সময় হল, এসো সব সাজ খুলে ফেলি
দুই হাতে আপন্ন সংসার
নিয়ে চলো ঘরে

দিন হয়ে এল ক্ষীণ ভূমধ্যসাগরে।

রেড রোড

খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছি ময়দানের গভীর তলদেশে
যেন নক্ষত্র তুলে নেয় আমার নিভৃত নিশ্বাস

এই অন্ধকার মণ্ডলের গহন থেকে আমার শব্দহীন স্তব
যেন পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে যায় স্বর্গীয় ঈথারে

আমাকে ভুল বুঝো না ব'লে দুহাত ছড়িয়ে দিতে টের পাই
চোখের ঢালু বেয়ে নম্র ঘাসের মতো ক্ষীণ জলরেখা

অল্পে অল্পে প্রাণ পেয়ে কেঁপে ওঠে হাওয়ায়
জানি না বুকের কতো নিচে নেমে যায় এর সর্বপায়ী শেকড়

কপালে হালকা পালক ছুঁয়ে ব'লে যায় রাত্রি ঃ
এই মাটি তোমার শরীর, একে স্পর্শ করো, জানো—

আর অমনি দশ দিগন্ত ভেসে যায় উপচে পড়ে দুচোখ
স্ফুরিত আনন্দে না কি দিশাহীন জলে

তারই পাশে রুল হাতে এগিয়ে আসে পুলিশ, বলে ঃ ওঠো
অবৈধ তোমার এই একলা অসামাজিক শুয়ে থাকা—

আবার আমি নিচু হয়ে পায়ে পায়ে চলতে থাকি শহরের দিকে
সামনেই ঝকঝকে রেড রোড।

সন্ততি

আবার ফিরে আসে এ-রকম নিজের মধ্যে ভ'রে-ওঠা দুপুর
যখন মাথার উপর নিকষকালো মেঘ
আর অগাধ পাটক্ষেতের কিনার ঘিরে আমাদের নিঃশব্দ চলা

ছমছমে প্রান্তর জুড়ে খেলনা দুই মানুষ
ভেসে ওঠে সুখে দুঃখে অস্পষ্ট অতীত দিন নিয়ে
ভয়ে ভয়ে স'রে আসে শস্যের পাশাপাশি খুব

কেননা এই সুখ এই দুঃখ এই আকাশ
আমাদের ছিঁড়ে নেয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যথাময়
গ্রামান্তের দিকে

শুধু ধরা থাকে হাত
হাতে হাতে কথা নেই কোনো
চোখে চোখ রাখি তবু কেউ কাউকে দেখতে পাই না আর

এ কি মৃত্যু ? এ কি বিচ্ছেদ ? না কি মিলনেরই অপার বিস্তার ?
এ কি মুহূর্তে ? এ কি অনন্ত ? না কি এরই নাম সন্তত জীবন ?

আমাদের মাঝখানে প্রথম বৃষ্টির বিন্দু নীল
আর তুমি নিচু হয়ে তুলে নাও একমুঠো মাটি

শূন্যে ছড়াও, আর চোখে চোখে না তাকিয়ে বলো ঃ
ভেবো না। ভেবো না কিছু। দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেদিন অনন্ত মধ্যরাত

বৃষ্টি হয়েছিল পথে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে
বাসা ভেঙে গিয়েছিল, গাছগুলি পেয়েছিল হাওয়া
সুপুরিডাঙার শীর্ষে রুপোলি জলের প্রভা ছিল

আর ছিল অন্ধকারে— হৃদয়রহিত অন্ধকারে
মাটিতে শোয়ানো নৌকো, বৃষ্টি জমে ছিল তার বুকে
ভেজা বাকলের শ্বাস শূন্যের ভিতরে স্তব্ধ ছিল

মাটি ও আকাশ শুধু সেতু হয়ে বেঁধেছিল ধারা
জীবনমৃত্যুর ঠিক মাঝখানে বায়বীয় জাল
কাঁপিয়ে নামিয়েছিল অতীত, অভাব, অবসাদ

পাথরপ্রতিমা তাই পাথরে রেখেছে শাদা মুখ
আর তার চারধারে ঝরে পড়ে বৃষ্টি অবিরল
বৃষ্টি নয়, বিন্দুগুলি শেফালি টগর গন্ধরাজ

মুছে নিতে চায় তার জীবনের শেষ অপমান
বাসাহীন শরীরের উড়ে-যাওয়া ম্লান ইশারাতে
বৃষ্টি হয়েছিল বুকে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে।

বাবরের প্রার্থনা

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়।
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান ;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে ?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের ?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে ?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

হাসপাতালে বলির বাজনা

আমার ভাই ছিল ফেরার, আমার মাসীমা যখন মারা যান।

চারদিকে ছুটছিল বাজি, কালীপুজোর রাত। হাসপাতালের বারান্দাও কেঁপে উঠছিল আনন্দে।

তালে তালে জাগছিল হিক্কা, শেষ সময়ের নিশ্বাস। হয়তো এবার শুনতে পাব ঃ রঞ্জন রঞ্জন

বেজে উঠল ঢাক, হাজার কাঠির ঝনৎকার। আমরা সবাই নিচু হয়ে কান নিয়েছি কাছে

ঠোঁটের ভিতর ফেনিল ঢেউ ঃ এল, ওই এল, ওদের নিশান, আমায় ছাড়ু। তুবড়ি ওঠে জ্ব'লে।

আমরা সবাই বলেছিলাম ঃ শেষ সময়ের প্রলাপ।

হাসপাতালে বলির বাজনা। ভাই ছিল ফেরার।

কবিতার মুহূর্ত

শঙ্খ ঘোষ

আর-এক দেশের এক সিনেমা হলে, অল্পই যেখানে লোকজন, অন্ধকারে হঠাৎ এপার থেকে ওপার ঘুরে যায় টর্চের আলো, আর সেই সঙ্গে জেগে ওঠে এক নারী কণ্ঠ : 'লস্ট চাইল্ড ? ইজ দেয়ার এনি লস্ট চাইল্ড ?' উত্তর মেলে না কোনো, ফিরে যায় আলো আর স্বর। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সবাই ফিরে আসে নিজের নিজের কাছে, গাঢ় হয়ে আসে চারপাশের হাওয়া, হারিয়ে যাওয়ার হাজার হাজার শুকনো পাতা ঝরে পড়তে থাকে মনের ওপর, আর সেই মুহূর্তেই হয়ে ওঠে কোনো কবিতা লেখার মুহূর্ত, তীব্র আর ধাতব।

কিংবা ধরো, মন ভালো নেই। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরছ একা। হালকা শীতের আলগা ঘরবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে যেন ভুতুড়ে কুয়াশায়, আর ওই দূরে পাতা জ্বালিয়ে আগুনের সেঁক নিচ্ছে তিনজন দেহাতি বুড়ি, কথা বলছে নিচু গলায়, সামান্য তার শব্দ আসে ভেসে। ওই ছবির পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে উলটো দিকে ছায়া পড়ল হঠাৎ, মস্ত এক জাহাজ : সেই মুহূর্তেই কবিতা লেখার মুহূর্ত।

এখন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, চরাচরে কেউ বুঝি জেগে নেই আর। এখনো তার ঘুম নেই মাথা থেকে চোখে। কাছেদূরের সমস্ত শায়িত মানুষের দীর্ঘনিশ্বাস তার গায়ে এসে লাগে। ক্ষীণ আলোয় গাছ থেকে বারান্দা অবধি ধুয়ে নিচ্ছে কোনো নিঃশব্দ পদচারণা। মনে পড়ে দিনের সব গ্লানি, মনে পড়ে দিনের যত ভুল, মনে পড়ে অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সময়ের সব টান, আর সেই স্মৃতি থেকে জ্যোৎস্না হয়ে আস্তে আস্তে জেগে উঠতে থাকে কবিতা, কবিতার মুহূর্ত।

না কি দুপুরবেলায় খোলা পথে অল্প বৃষ্টির ঝাপট নিয়ে ঘুরে বেড়ানো? সবারই যদি কাজ আছে, তোমার কোনো কাজ নেই? দায় নেই কোনো? ঝিরঝির করছে দিন, সকাল থেকে বৃষ্টির কোনো শেষ নেই, কিন্তু তার তোড়ও নেই তেমন। ভেজা পথ, ভেজা গাছ, ভেজা দেয়ালের পাশ দিয়ে কেবলই হেঁটে যাওয়া, ভেজা শরীর নিয়ে। এ কি শহর না কি গ্রাম? এ কি সুখ না কি দুঃখ? এ কি জন্ম না কি মৃত্যু? আনন্দভরা এই দ্বিধার মধ্য দিয়ে সেই হলো এক কবিতা লেখার মুহূর্ত।

অথবা যখন মরিয়া বেগে ছুটে আসে বন্যার জল, জনপদ যখন ভেসে যায় হাজার হাজার মানুষের ঘর ভেঙে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে, যখন পশু আর মানুষ একই সঙ্গে হাহাকার করে বাঁচার তাড়নায়, মাইল মাইল জলের ওপর ভেসে থাকে কয়েকটি উঁচু দ্বীপের মতো সাময়িক আশ্রয় শুধু, চোখের সামনে যখন মানুষেই বাঁচায় আর মানুষেই মারে, যখন রাত্রিশেষে ঝকঝকে সূর্য পরিহাস নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘোলা জলের উপর ভেসে-যাওয়া শবে, সেই প্রখর বাস্তব অথচ অবাস্তব মুহূর্তেই আজ আমাদের কবিতা লেখার মুহূর্ত।

মৃত্যু তার মুখে রেখে যায়, রেখে যাক, কেবল জীবনের সৌন্দর্য।

কবিতা

খালি পায়ে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমাদের মাথাগুলোকে বেড় দিয়ে সূর্য,
যেন এক জ্বলন্ত উষ্ণীষ ;
বাঁজা মাটি,
যেন আমাদের পায়ের নিচে দু পাটি খড়ম।
এক বুড়ো চাষী
তার বেতো মাদী ঘোড়ার চেয়েও
যেন ঢের বেশি ঘাটের মড়া
আমাদের কাছেপিঠে

আমাদের কাছেপিঠে নয়
বরং অন্তর্দেশে
আমাদের জ্বালাময় ধমনীতে।

ফতুয়াখোলা কাঁধ
চাবুকছাড়া হাত ;
বিনা ঘোড়ায়, বিনা শকটে
গাঁয়ের দুফাদার ছাড়াই
আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি
ভালুক-বাসার মতন গাঁয়ে গাঁয়ে
প্যাচপেচে শহরগুলোতে,
ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড় পেরিয়ে।

রোগা গরুগুলোর চোখের জলধারায়
আমি শুনেছি
পাথুরে জমির কণ্ঠস্বর ;
আমরা দেখেছি সেই মাটি
লাঙলের কালো ফলার মুখে
ফোটাতে পারে নি সোনালি ফসলের সঞ্জীবনী মন্ত্র।
আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি,
না গো !
স্বপ্নচালিতের মত নয়।
এক আবর্জনার স্তূপ থেকে রওনা হয়ে আরেক আবর্জনার স্তূপে।
আমরা
জানি
একটি দেশের
কী মনোবাসনা।
একজন বস্তুবাদীর
মানসিকতার মতই
স্পষ্টাস্পষ্টি এই চাওয়া,
আর বস্তুতেই
এই চাওয়ার মধ্যে
রয়েছে সত্যিকার বস্তু।

নাজিম হিকমতের অনুবাদ

কোথায় আমার ছোট্ট সোনা দাদুভাই খেলবে বল তো ?
মেঝেতে গালচে আছে দেখাই যায় না,
বিবিধ বিচিত্র সব আসবাবে ঠাসা,
দম বন্ধ হয়ে আসে।

ইয়া লম্বা আলোক স্তম্ভটা ঘরে কেন ?
শোভা বাড়াচ্ছে ? কার ?
ওই আলোক-স্ট্যাণ্ড দেখার জন্যে
নিয়ন লাইট জ্বালতে হয়।
সুন্দরকে নিজের প্রভায় না দেখলে
চোখে আঙুল দিয়ে তাকে দেখানো যায় না !
—এই সহজ কথাটা বোঝাই কাকে ?

সুন্দর সৌখিন সুচারু দ্রব্যে ঠাসা ঘর,
শতাব্দীর উপযোগী বটে !
কিন্তু ঘর থেকে সুকুমার বেরিয়ে গেল,
ছেড়ে গেল করুণা, মমতা···
তাদের জন্যে জায়গা নেই !
শুধু চাপাচাপি বিচিত্র আসবাবে।
একবার এসে যে-কেউ দেখেই যাক না
মনের চৌকাট পেরিয়ে উঁকি দিয়ে।

বনজ ভ্রমর

সুনীলকুমার নন্দী

এখন খেলার মাঠে বেলা যায়, তুমি
ঘরে বসে
বুকের বসন থেকে
গানে-গানে, বনজ ভ্রমর রেখে ফিরে গেছো
কেউ না-জানুক, আমি জানি ; অন্ধকারে
অদৃশ্য ছায়ায় মিশে
অনন্ত উদ্ভিদ যেন তোমার শরীর
নেমে আসে, চারিদিক
একা, ঘরে
সারারাত ভ্রমর ছড়ায়
রক্তের গভীরে নীল-তরল আগুন।

বুকের মধ্যে

আনন্দ বাগচী

বুকের মধ্যে হয়ত কোন স্টেশন আছে ঃ ঝাঁ ঝাঁ দুপুর।

নিরিবিলি একটেরে সব স্টেশনগুলো যেমনতর
শুকনো ইঁটের রঙীন বাড়ি, রেলিং-ঘেরা মোরাম ঢালা
জায়গাটুকুর এক কিনারে কৃষ্ণচূড়া জারুল বকুল
ছায়াতে তার পানীয় জল, পেটা লোহার ঘণ্টি ঝোলে,
কেমন যেন খাঁ খাঁ দুপুর ছন্নছাড়া চায়ের স্টলে
দু এক চুমুক খুচরো মানুষ ঃ রেল-খোয়ানো গাঁটরী থলে
বুকের মধ্যে এমনতর স্টেশন ছুঁয়ে স্টেশন ছেড়ে
কেউ কি গেল মেল ট্রেনে বা প্যাসেঞ্জারে, ঘণ্টি হল
চমকে তাকাই, দেখতে কি পাই : বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ দুপুর।

নদীর পাশে মানুষ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কেউ কাছে নেই, জলাঙ্গীর পাশে বসে আছি। এখানেই
নদীটি নিয়েছে বাঁক, এখানেই রূপালী ইলিশ তার
সমুদ্রের সমস্ত অতীত নুন হারিয়ে আবার
হয়ে উঠছে স্বাদু। কবি জীবনানন্দ ছিলেন ওপারে
এপারে এখন কোনো কবি নেই।
আজ সকাল থেকেই বাতাস দিয়েছে খুব, তাই দূরে
হোগলার অনুচ্চ বনে মাঝে মাঝেই জেগে উঠছে অসংখ্য ধনুক!
এক বিশাল অশত্থ পাতা নেমে এলো ঘুড়ির মতোন ঘুরে ঘুরে
বাকলের গা বেয়ে নামছে পিঁপড়ে, তুমি কি উৎসুক
তুমি কি ঐ "পিপীলিকা পিপীলিকা দলবল ছাড়ি একার" সমান
ছোট হয়ে নেমে যেতে চাও ধরিত্রীগভীর সংগোপনে ?
কীট, পতঙ্গ, সকলেই ক্ষুধিত অথচ নদীতীরে কেউ ঝগড়া করছে না
মানুষেরও পাশে নেই সন্দিগ্ধ মানুষ,
এই সঙ্গী জলাঙ্গীর পাশে
একজন বয়সবিষণ্ণ কবি বসে আছে।

বৃষ্টি আমাকে

মানস রায়চৌধুরী

বৃষ্টি আমাকে দুঃখের গান বলে
আমি বুক চেপে রয়েছি ঘুমের অতলে
শেষ রাত্রিতে ভেসে যায় বিছানার
উত্তাপ আর নিদ্রার অধিকার।
দুঃখের গান ভাঙা জানলার কাচে
কতকাল ধরে বাঁচে ?
এই কথা যাকে শুধাতে চেয়েছি সে-ও
এসব প্রশ্ন সহজে করেছে হেয়
এর পরে কিছু থাকে ?

থাকে কিছু সুখ অজানা জলের বাঁকে
মৃত্যু যেমন দোকান সাজিয়ে রেখেছে
ক্রেতারা নিয়েছে নানা আসবাব বেছে
ঠিক সে রকম বৃষ্টির গান দুঃখে
ঘুমে অচেতন বুক কে
ভরে দিয়ে বলে যায়
অল্পই সুখ, সে-ও কর্পূর মুহূর্তে উবে যায়।

অগ্নিপরিধির দিকে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

"অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,"—জীবনানন্দ

অগ্নিপরিধির দিকে
ক্রমাগত উড়ে যায় এরোপ্লেন,
তারপর ভস্ম হ'য়ে ঝরে।

মানুষ প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে না—
ছোটো ছোটো সুখ নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়,
বাড়ি করে, বাগানে গাছের আড়াআড়ি
ছেলে কোলে পায়চারি করে।
সিগারেট ফেলে দিয়ে একা একা হাসে।
মাঝরাতে, ক্রেনের মতন ঠিক নেমে আসে
পত্নীর শরীরে।
এইভাবে চলে।

কিন্তু হঠাৎ তার দড়িদড়া সব খুলে পড়ে—
সে তখন একবার, একমুহূর্তের জন্যে
বেঁচে থাকতে চায়।
আগুনের মধ্যে গিয়ে গালিয়ে ফেলতে চায় সমস্ত ভেজাল,
যার ডাক মাঝে মাঝে মাঝরাত্রে শোনা যায়, তার মতো
শুদ্ধ হ'তে চায়।
সে তখন জেট প্লেনে উঠে বসে, যে-প্লেন
অনেকদূরে যাবে।
অগ্নিপরিধির দিকে
তার দেহ স্পষ্ট ছুটে যায়।

যদি যায়

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

গায়ে হাত বোলাইনি যেন দীর্ঘকাল
বুকে মুখ রেখেছি কখন, মনে পড়ে না মা।
পুরোনো শরীরে এত কষ্ট নিয়েছিলে
এ সুদীর্ঘ অপেক্ষার কাল
কাছে থেকে ভুলে গেছি এত কিছু ছিল করণীয়।
ঋণ শোধ কাকে বলে ? সেবা কি শুশ্রূষা
কিছু নেই। শুধু গান, আছে শুধু গান।
শৈশবে শয্যার পাশে গান
কৈশোরে খেলার ছলে গান
যৌবনে হাজার অজুহাতে
তোমাকে ভুলেছি, তবু সঙ্গে ছিল অবিচ্ছিন্ন
প্রিয় কণ্ঠস্বর।
এবার চোখের জল নাও ঋণ শোধ, গান নাও
তোমার সমস্ত দান তোমাকে ফেরাই, যদি যায়।

মুখ্য কুশীলব

হরিপদ দে

কথাটা এই ঃ সকলের অনুমোদন চাই
কিন্তু প্রতীক্ষায় থাকি না
কাছে গেলে শূন্য হাসি, দূরে গেলে অকারণ হাততালি
অদৃশ্য হাত টেনে নেয় ধ্বংসস্তূপের দিকে।

কথাটা এই ঃ রাতের ফুটপাত খোলস পাল্টায়
অগ্নিলোভী পতঙ্গের আরণ্য উল্লাস।
দুপুরে ঝলসানো গ্রামের পথ
আনমনা বাউলের একতারায়
জন্ম ও মৃত্যুর অনন্তধারা।

কথাটা এই ঃ অন্ধকারে ডানার ঝাপট
রাশি রাশি শীর্ণ হাত
যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে
নিদারুণ পক্ষাঘাত
এখানে বকুলের গন্ধ আনে না বাতাস।

কথাটা এই ঃ যাদের দুঃখ থেকে উঠে আসে রাত
রক্তে জ্বলে ভোরের আকাশ
তাদের কথা আপাতত থাক।
রাতকে কলুষিত
আলোকে কালো করে যারা
তারাই মুখ্য কুশীলব আজ।

নীলকণ্ঠ—অবাঞ্ছিত আমরাই

সলিল লাহিড়ী

সমুদ্র মন্থন শেষ,—
অমৃতে—সৌভাগ্য—আনন্দ সবইতো বিভক্ত হোল—
জীবনের যত সুখ তোমাদের হাতে।
আর সব অবশিষ্ট পড়ে থাকা,—
অতলান্ত দুঃখের যা কিছু গরল—পান করে নীলকণ্ঠ,
অবাঞ্ছিত—অনাদৃত আমরাই।

দুঃখকে পানীয় করেছি
আমাদের বেদনার আশ্চর্য সম্পদ।
তোমাদের আনন্দের—অমৃতের—সৌভাগ্যের সাক্ষী হয়ে,
অবাঞ্ছিত আমরাই—আমাদের মৃত্যু নেই।

চাষির কারখানায় যাওয়া সহজ নয়

সত্য গুহ

শরীরে বয়স লাগলো
বাড়িতে লাগিয়েছিলাম পলাশ গাছ
খাঁচায় রেখেছিলাম কোকিল
হা হা করে হাসবে ভেবেছিলাম বকুল
আশা ছিলো
সারা গায়ে মাটি মাখামাখি এবং ভালোবাসার উৎপন্ন শস্যে
শিল্পিত ভরাট জীবন
এক অখণ্ড প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বো
ঘুম
রাত্রির নিপুণ তুলি দিয়ে আঁকা অন্ধকার
সমস্ত আলোর আলোড়নহীন বিশ্রাম
তেমন শীতের দীঘি

শরীরে বয়স লেগেছে এখন, ভরা যৌবনে অবেলা
ভালোবাসা ভেঙে গেছে
ভস্ম অপমান শয্যা ছেড়ে উঠে
পুষ্পধনু এখন পঞ্চশরে যতই না দগ্ধ করুক আকাশ
যতই না অরণ্যে আলপনা হোক
কোকিল নিজে বাসা বুনে ওম-এ বসুক ডিমে
স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা অব্দি মরে গেছে
এখন সব কিছু ধূসর
রক্তের ভিতরে নিঝুম অবসাদ
শীত
সাজিয়ে তোলা বাগানে
স্বপ্নের কঙ্কাল
মৃত্তিকার কাপড় বদলাতে সময় লাগে না, এই বসন্ত তো ওই শরৎ

জমি যদি হস্তান্তরিত, চাষির কারখানায় যাওয়া সহজ নয়।

ঘুণপোকা

মতি মুখোপাধ্যায়

ঘরের ভেতরে একটা ঘুণপোকা, নাকি কোন কাঠুরে
অনেক দূরে, দূর বনে, কাটছে কাঠ
তারই শব্দ দিনরাত ঃ কুরু···র কুরু···র কুরু···র
একলাফে ভূরুর থেকে নেমে চোখ
খুঁজছে তাকে, কোথায়, কোথায় সেই পোকা
অথবা বোকা সেই কাঠুরে, যে
কালিদাসের মতো, নিজের ডালে নিজেই···

ঘরের ভেতরে একটা ঘুণপোকা···
ঝুরঝুর ঝরে পড়ছে বুকের থেকে হৃদয়
টাটকা সবজীর থেকে ভাইটামিন
টকটকে লাল গোলাপ চুঁয়ে রঙ
বাতাসের থেকে অক্সিজান
·····ঝরে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে সব
কুমারীর বুকের থেকে স্তন
ভালোবাসার থেকে ন্যাপথালিনের ঘ্রাণ
শিউলি·····চুণ বালি

কোথায় পোকা
মানুষ এখন বোকার মতো,···নিজের ডালে নিজেই···

একখানা ঘর

শ্যামলকান্তি দাশ

তোমার মূর্তি রাখার জন্য
একখানা ঘর যথেষ্ট নয়
আরেকখানা কিনবো চলো
কোন্ সে দ্বন্দ্বের সারাজীবন
আমরা দু'জন পূর্ণ বলো

প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে
দ্বন্দ্বও যদি থাকেই থাকুক
হঠাৎ-পাওয়া নতুন ফুলে
পরিত্রাতা গন্ধ রাখুক

একখানা ঘর অচিহ্নিত
একটি ঘরেই রেষারেষি
হোক না বৃহৎ গ্রহের সঙ্গে
উপগ্রহের মেশামেশি

মূর্তি রাখার জন্য এখন
একখানা ঘর যথেষ্ট নয়
আরেকখানা আসুক কাছে
এক জীবনের দ্বন্দ্বে মধুর
আধভাঙা চাঁদ ঘুমিয়ে আছে

বড়োই জরুরী

শুভ মিত্র

মাঝে মাঝে—গাছেরাও পাতা ঝরিয়ে দেয় ;
এই রকম নির্ভার হয়ে ওঠা
মাঝে মাঝে বড়োই জরুরী।
যেমন, হাওয়া বদলায় রোগী কিংবা
বুড়ো মানুষ।

এ সবই আরোগ্যের আয়োজন
ফুল তুলে তুলে শিল্প রচনা ;
তারপর, ন্যাড়া গাছে লাগবে হাওয়া—
দুঃসময়ের পাথর ফাটিয়ে,
হা হা হাসবে জীবন
আর, আরামকেদারায় নিশ্চিন্তে ঘুমোবে
একজন রোগী কিংবা বুড়ো মানুষ।

মাঝে মাঝে সব বাতি নিভিয়ে দিতে হয়,
সব বাতি জ্বালাবার আগে……।

এর চেয়ে

এর চেয়ে ঢের ভালো ফিরে যাওয়া সবুজ প্রত্যুষে
যেখানে সরল মন নির্দিধায় ধূলিমুঠি নিয়ে
সারাবেলা খেলা করে নির্ভয় বিবাদে
পাইন অঙ্গুলি নাড়ে ঊর্ধ্ব শির দীর্ঘ ঋজুতায়।

এর চেয়ে ঢের ভালো অজ্ঞতায় ব্যথা দিয়ে ফেলা
শার্দুল হিংস্রতা চোখে ভুলেও খেলে না
যেমন জোয়ার এলে নদীবুক ফুলে ফেঁপে ওঠে
ঠোঁটের দু' তীরে তাই জল হবে ঘোলা।

আমি জানি ঢের ভালো ফিরে যাওয়া সবুজ প্রত্যুষে
সর্পিল কুটিল পথ যেখানে ঘেরেনি
সারাদিন শুধু খেলা নির্ভয় বিবাদে
দীর্ঘ ঋজু পাইনের শ্যাম স্নিগ্ধ প্রান্তর ছায়ায়।

আমি জানি ঢের ভালো অজ্ঞতায় ব্যথা দিয়ে ফেলা
হিংস্রতায় চোখ দুটো তপ্তবালু হয় না নির্দয়
যেমন জোয়ার এলে নদীবুক ফুলে ফেঁপে ওঠে
ঠোঁটের দু' তীরে তাই আলোড়ন সমমর্মীতায়।

রক্ত বেচে দিয়ে

ওদের ঘরে যে যাব—উপায় নেই
তোমার গায়ে বনেদী আলখাল্লার বিষ
ওদের জন্য যে কাঁদব—উপায় নেই
চোখের জলে নোন্‌তা বড় কম
ওদের কাছে যে বসব—উপায় নেই
মাঝখানে শ্যাওলা পিছল দীঘির ঘাট—
তবে কি গায়ের রক্ত বেচে দিয়ে
পাগলাঘণ্টি বাজিয়ে দেব --
ছুঁয়ে দেব লালবাজারের সদর দরজা !

ওদের আগুনে যে নেভাব—উপায় নেই
হাইড্রেনট আর লালদিঘি
লিজ্‌ গিয়েছে তোমার লম্বা জিভে
ওদের দাওয়ায় যে ছন্‌ বিছাব—উপায় নেই
সারা জমির দাদন তোমার ভরা মটকীতে
ওদের যে স্বপ্ন দেখাব—উপায় নেই
মিথ্যে কথার সাক্ষী মনুমেন্ট
তোমার পায়ে আল্‌তা পরায় !
তবে কেন খাজনা ছাড়াই তোমার আলখাল্লায় মৌরসীপাট্টা
রক্তের রঙ গাঢ় নীল
তবে কেন আমার ঘরে নীলামের হল্লাগাড়ি
মায়ের বন্ধকী রক্ত তোমার কব্‌লা নেওয়া খালে ।
তবে কি গায়ের রক্ত বেচে দিয়ে
পাগলাঘণ্টি বাজিয়ে দেব—
ছুঁয়ে দেব রাজভবনের সিংহ দরজা !

তোমার রক্তচক্ষু আমি দেখেছি
দেখেছি সেনা অক্ষৌহিনী
তোমার কবজিতে উল্কির দাগ আমি দেখেছি
দেখেছি শিরায় গরম পারদ
অথচ আমি তো জানতাম
তুমি পাকা রাস্তা ছেড়ে বেছে নেবে ভ্যাপ্‌সা নালা
ছাউনি বেচে দেবে সস্তা জলের দামে
তবে কেন রক্তচক্ষু তর্জনী
তবে কেন ঠিক্‌জিতে লাল ফিতার ফাঁস !

আমার ঘরের চৌকাঠ তুমি দেখেছ
দেখেছ ফেনা ভাতের আহ্লাদ—
আমার ঘরে মাটির সরা তুমি দেখেছ
দেখেছ দেউলে কাঁধে বাঁকের দাগ
অথচ তুমি তো জানতে
আমার আলখাল্লায় গাঙ্‌ ফড়িঙের আভা
আঙিনায় রক্তবীজের মড়াই
তবে কেন চিলের ডানায় মোমবাতির ঝাড়
তবে কেন মুঠির ভেতর আগ্রাসী ষড়যন্ত্র !

আমার চৌকাঠে এখন ইস্পাতের শিকল
তালুতে শ্বেত করবীর গোটা
তোমার জমিতে শিল নোড়ার চাষ
মাটির সড়ায় মৃত্যুর ছোবল !

সাক্ষী দিয়ে এলাম

আমি এইমাত্র জবানবন্দী দিয়ে এলাম
দিয়ে এলাম সই সাবুদে আমার সাক্ষী—
লাসকাটা ঘরে তোমার ভরা শরীর ব্যবচ্ছেদের জন্য
আর একটা টেবিল বসানো হবে
লেখা থাকবে—"ফর্ লিভিং কোয়াড্রুপেড্" ।
আমি এইমাত্র জবানবন্দী দিয়ে এলাম
দিয়ে এলাম আমার সাক্ষী ।

যখনই মনে হয়
আমি একদিন থাকব না—
অথচ সারা উঠোনে ছড়ানো থাকবে আমার দীর্ঘশ্বাস
আমার মৃত শরীরে নীল রঙা মাছির ঢেউ
গলার ক্ষতে ধারালো চাকুর স্বাক্ষর
বিশ্বাস কর—
আমার বুকের গভীরে প্রশ্বাসের উত্তাপে শুকায়
তোমার জীয়ন কাঠির অবাধ্য লোলুপতা—আর
বিশ্বস্ত সখ্যতার অনির্বাণ শাপান্তর ।

অথচ আমিও তো চেয়েছিলাম—
গেরুয়া রংয়ের ফালি কেটে আনব তোমার ছুরির ফলায়
কাঁটা ছাড়াব গোলাপের ডাঁটি থেকে—
কিন্তু হৃৎপিণ্ডের চুক্তি ভেঙ্গে যখন সে ইস্পাত
জায়গা নেবে আমার গলার শিরায়—
এবং যখন আমি আর থাকব না
আমার মৃত শরীরে নীল রঙা মাছির ঢেউ
বিশ্বাস কর—
আমার শ্বেত আর লোহিত কণিকার মৃত দীর্ঘশ্বাস
রূপান্তর নেবে থকথকে মরচের নিঃশব্দ কালাবিষে ।

লাস কাটা ঘরে তোমার জ্যান্ত শরীর ব্যবচ্ছেদের জন্য
আর একটা টেবিল বসানো হবে—
আমি এইমাত্র জবানবন্দী দিয়ে এলাম
দিয়ে এলাম সাক্ষী ।

কেউ খবর রাখেনি

কেউ খবর করেনি—
তোমার হারিয়ে যাওয়া চশমার খাপ খুঁজতে
আমি এইমাত্র কবিতার রক্তে তর্পণ করে এলাম
তোলপাড় করে খুঁজে এলাম
অপুর লাটাই আর দুর্গার লাল রঙা কোরা শাড়ীর পাড়
সারা নিশ্চিন্দিপুরের জঙ্গলে ।

তোমরা তো কবিতার জন্য অমরত্ব ত্যাগ কর
খুন কর সোনার মাছি—
তবে কেন সারারাত আমি বিছানায় ঘুমাই
খাবার সময় খোঁজ করি থালা
গাইতে গিয়ে বুজে ফেলি হাতের মুঠো ।

কেউ খবর করেনি—
যখনই ভেবেছি আমি একদিন মরে যাব
মায়ের কান্না আমার চোখে টানবে না জল
সত্যি বলছি—
আমার যন্ত্রণার একটুও উপশম হয়নি
তোমার গালপাট্টা হাসিতে ।
যখনই ভেবেছি আমি একদিন মরে যাব
চোখ থেকে সরে যাবো আলো
দাওয়ায় পড়ে থাকবে আমার ছড়ান কবিতা

বিশ্বাস কর—
আমি সারা গঙ্গায় খুঁজে ফিরি
সগর রাজার যোয়ান ছেলের ভস্ম
খুঁজে ফিরি কাঠের হাত-বাক্স
আর অপুর দুধের বাটি
সারা নিশ্চিন্দিপুরের জঙ্গলে।

হাত ভরা স্থির প্রত্যয়

কখনো বিশ্বাস করিনি
হাত ভরা স্থির প্রত্যয়ের
অন্তর্গত রক্তের চেতনা
স্থবির স্বাদু ইচ্ছায়!

কখনো বিশ্বাস করিনি
আত্ম অন্বেষার বিবিক্ত মুহূর্তে
অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশের প্রত্যক্ষ দৃশ্যময়তায়
অখণ্ড নৈসর্গিকতা।
অথচ সুদুর্লভ তিরিশটা বছরের
কা
ল
ক্ষ
য়ী
সংগ্রামের অনেক প্রহর রণক্লান্ত
জীর্ণ বলীরেখায়।

বৈরাগীর ঝোলায় মুক্তি হোক সে আইখম্যানের
সূচাগ্র ইন্দ্রিয় চেতনার অলৌকিকতায়!

অস্থায়ী দীর্ঘশ্বাসের কিনারায়

এখন সারাদিন কবিতার আমসত্ত্ব কাঁধে নিয়ে
লেফট্‌রাইট্‌! লেফট্‌ রাইট্‌!
ডা
ই
নে
মোড়
বাঁ
য়ে
মোড়
তোমরাই তো বলেছ—
আমার অস্থায়ী দীর্ঘশ্বাসের কিনারায়
আমি কোন গর্ত রাখিনি
রাখিনি সতের খানাখন্দ তত্ত্বের বেনারসী পাড়ে।

এখন তোমার চোখে সুতো কাটা ঘুড়ির রঙ
কব্জিতে জাবর কাটা ষাঁড়ের কুঁজ
দুধের কাপে ভেঁয়ো পিঁপড়ের ডাঁই—
যেমন আমলকী গাছে কালো বুনো ভাম
বিশ্বাসের কেদারায় ঔরঙ্গজেবের দুল—আর
হুমায়ুনের সিঁড়িতে "আকাশ পুলের" নক্‌সা।

আমার কবিতার অক্ষরে এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের হোম
প্রেমে পোড়া কল্‌জেতে নীল রঙা ডুমো মাছি—
তোমরা তো জানই—
বহুদিন নচিকেতার উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত……" বাক্যে
আমার যন্ত্রণার উপশম হয়নি এতটুকু!

এখন সারাদিন কবিতার শীতলপাটি আর
বেহালার ছড় কাঁধে নিয়ে
লেফট্‌রাইট্‌! লেফট্‌রাইট্‌!
আগে বাড়ো—আগে বাড়ো।

ছুতার

শেষে ছুতার বললেন, 'আর কি বানাবো ?'
জীবনের ক্ষুধা থেকে বেঁচে গেছে কিছু কাঠ ; আর করাত,
হাতুড়ী ও পেরেক, ওরা সেই আগের মতই বন্ধুভাবাপন্ন ;
তাই একদিন বিকেলবেলায়, ছুতার ভাবলেন, 'আর কি বানাবো ?'…

শেষে মানুষ বানালেন ; কাঠের পরিশ্রমের, জোড় দেওয়ার ;
সে মানুষ কথা বললো না, চা খাওয়াতে বললো না,
শুধু পেরেকে পেরেকে, জোড়ে জোড়ে, খেলে বেড়াতে লাগলো
হাওয়া, খেলে বেড়াতে লাগলো শিল্প ও সাহসিকতার গান ;
তারপর ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগলো করাত ঘরের চালে,
উড়ো ঝড় এলো উপর থেকে, ঠান্ডা হ'য়ে আসতে লাগলো হাত-পা,
চোখের মণি থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো একটি তুচ্ছ মানুষের
জীবন-বৃত্তান্ত, দেওয়ালে হেলান দিয়ে সেই ছুতার বললেন ঃ
'আমি শুধুই ক্ষুধার নয়, আমি শুধুই নিদ্রা ও পিপাসার নয়,
শিল্পের জন্য আমি একটা কাঠের মানুষ বানিয়ে গেলাম…… ।'

উদ্দেশ্য-বিধেয়

উদ্দেশ্যের মধ্যে থেকে একদিন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো
বিধেয়, এসে, একে অপরকে চোখ মটকে বললো, তুমি কার গো ?
ফলে দুজনেই ব্যাকরণ বই থেকে বেরিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে চললো
কলকাতা ময়দানের দিকে ; ফলে যে শূন্যতা পেলো ব্যাকরণ বই,
সেই শূন্যস্থানে এসে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে,
পৃথিবীর সমস্ত নারী পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে, পৃথিবীর সমস্ত
পিতা তার পুত্রকে, সমস্ত প্রেমিক আর প্রেমিকাকে
প্রশ্ন করতে লাগলো ঃ কার গো ? তুমি কার গো ? তুমি ?……

অনেক মুখ চাওয়া-চাওয়ি হলো পৃথিবীতে, উত্তর হলো না ;
এমন আশ্চর্য কোনোদিন হয়নি মানুষ, এমন অবাক
কোনদিন হয়নি পৃথিবী, এমন বিস্ময় কোনোদিন দেখেনি সংসার ;
ফলে সন্ধ্যেবেলায়, দুজন বিষণ্ণ ও গম্ভীর মানুষ, উদ্দেশ্য বিধেয়
তার পর ধীর পায়ে ফিরে এলো ব্যাকরণে, সেই সনাতন অস্তিত্বের মধ্যে ;
এসে, কোনোকিছু না বলে, ঘুমিয়ে পড়লো চিরকালের মতো !

ফুঁ

ইচ্ছে হয়, খুব জোরে একটা ফুঁ দিই নিজের ভেতর
কিন্তু ভয়, যদি ফুঁ দিতে গিয়েই দেখি—শরীর উধাও !
যেমন একদিন অফিস-ফাইলের মধ্যে ফুঁ দিতেই,—কালো ও
শীর্ণ চেহারার একজন মানুষ বেরিয়ে, বিনয় এবং তস্য বিনয়ের সঙ্গে
গলা কাঁপিয়ে বলেছিলো, 'সবগুলো এখনও ক্লিয়ার হয়নি স্যার……
যেমন একদিন সামাজিকতার মধ্যে ফুঁ দিতেই, কঙ্কালসার
কয়েকজন মানুষ বেরিয়ে পড়েছিলো, ভদ্রতার জন্য শুধু
এ জীবনে যারা আর কিছুই পেলো না !
যেমন একদিন ভালোবাসার মধ্যে ফুঁ দিতেই—বেরিয়ে পড়েছিলো
মানুষের ছেঁড়া ছেঁড়া কান্না, তার ভাঙা গলার আওয়াজ, তার চোখ ও
ছানিপড়া চোখের কাকুতি…

ইচ্ছে হয়, খুব জোরে একটা ফুঁ দিই নিজের ভেতর ;
কিন্তু, মায়া না মতিভ্রম, সত্য না মিথ্যার ঝালর দেওয়া পরিহাস,
না কিংবা হ্যাঁ, কি বেরিয়ে পড়বে আমি তো জানি না ।
তাই ভয়, শুধু ভয়, যদি ফুঁ দিতে গিয়েই দেখি—শরীর উধাও !

সমস্ত দরজা খুলে তাকে বলা হলো—যাও,
সে কোথাও যেতে পারলো না ;
সকল প্রান্তির মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে বলা হলো—নাও,
সে কিছুই নিতে পারলো না তেমন ;
সমস্ত অনুকূলের মধ্যে ডেকে নিয়ে তাকে বলা হলো—চাও,
উল্লেখযোগ্য সে কিছু চাইতে পারলো না ;

শুধু হরিতে, নিলীমায়, উপসংহারে ভাঙা কান্নার মতো
ভেসে বেড়াতে লাগলো এক টুকরো নিরুৎসাহ, ভেসে বেড়াতে লাগলো
মানুষের এই অক্ষমতা মেশানো একটুকরো হতাশার গান ;
সারা প্রহর ধরে শুধু শোনা গেলো তাঁত কলের শব্দ, তাঁতী আর
তাঁতীর বৌয়ের ঝগড়া, তাঁতীর ছেলেমেয়েদের চেঁচিয়ে বর্ণ পরিচয় পাঠ ;
আর নঙ্গরখানা থেকে, মাঠ থেকে, জাহাজের জেটি থেকে শোনা গেল
শুধু মানুষের আর্তনাদ, 'কিছুই তো হলো না এ জীবনে, হায়,
কিছুই তো…।'

কবিতার রক্ত মাংস

কৃষ্ণ ধর

কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনগুলোই কবিতার রক্ত মাংস শরীর বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের সঙ্গে মদৎ দিচ্ছে কলকাতার বাইরের কিছু কাগজ, তাদের আশ্রয় করে থাকা তরতাজা তরুণ গোষ্ঠি। দশকের নিঃশব্দ কল্লোলে যারা উচ্ছল, তারুণ্যের তটভূমি যাদের ঢেউয়ে উদ্বেল, স্বপ্ন আর জিগীষায় যাদের কলম তরবারির মতো ধারালো।

এই রকমটা দেখে আসছি কিশোর বয়স থেকে। কবিতার রক্তের স্বাদ যখন ছিল সুমিষ্ট। জীবনের রসে অভিসিঞ্চিত হয়ে যা ক্রমশ লবণাক্ত অথচ স্বাদু হয়েছে দিনের পর দিন। বাংলা কবিতার এই প্রসারিত দিগন্ত রেখার উদ্দেশে যাদের যাত্রা তাদের দীর্ঘ মিছিল থামেনি, এখনো চলেছে। সত্তরের ছায়া কবিতার আন্দোলনের মসৃণ অলিন্দে উত্তুরের হাওয়ায় দোদুল্যমান। অস্পষ্ট আলো ছায়ায় দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো মুখ ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত কিন্তু তৎপর উদ্‌গ্রীব নতুন ঢেউয়ের শব্দ শোনার জন্য। এই ছায়া দীর্ঘতর হতে হতে একদিন আশির দশককে স্পর্শ করবে, তাদের রক্তে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করে অবিরল খেলায় মত্ত হয়ে উঠবে নিজস্ব উৎসবে। সে উৎসব কোনোদিন শেষ হবে না, তা চলতেই থাকবে। সে থামে না। ধমনীতে ধমনীতে তপ্ত রক্তের স্রোতে তার জাগরণ। শত শত শতাব্দী ধরে এইসব কবিতা আমাদের মোহাবিষ্ট করেছে। সে যতটা গ্রহণ করে, দেয় তার চেয়ে বেশি। সে অঋণী এবং চিরকাল অপ্রবাসী। সত্তার ভিতরে তার রোমাঞ্চিত উপস্থিতি।

তাই প্রতিদিন নতুন কবিতার কাগজ জন্ম দেয়। এই বাংলাদেশে কবিতার মৃত্যু হয় না। কবির রক্তে তার জীবনযাপন। তার জীবনযাপনে কবির অস্তিত্বের স্বীকৃতি।

যদি তাই হয় তাহলে কবিতা আমাদের সংস্কৃতির প্রধান স্মারকচিহ্ন হতে বাধা কি ? আধুনিক কবিতার নাইটএরান্টরা সেই স্মারকচিহ্ন বুকে

ঘরে প্রতিদিন জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হন।

কবিতা স্বপ্ন ও সংগ্রাম দুই-ই। কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রকলা এই তিনটিই অমলত্রয়ী। সে অন্তর্দৃষ্টির বলে অনুভূতিকে এমনভাবে সজাগ ও সমুন্নত করে তোলে যা দিয়ে আমাদের চারপাশের জগতের কোনো একটা দিক যেন এইমাত্র উন্মোচিত হল বলে মনে হয়। শব্দের মন্ত্র দিয়ে সে রহস্যাবৃত সেই জগৎকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। তাকেই বলব আমরা কবি যিনি পাঠকের মনে কবিতার অনুভূতি জাগাতে সক্ষম। কবি যে-মানসিক অনুভূতি থেকে দৃশ্যমান জগতের ভিতরকার দ্বন্দ্বকে কাব্যের ভাষায় ও ছবিতে রূপান্তরিত করেন পাঠকের মনে সেই অনুভূতি জাগাতে পারলেই তাকে বলব কাব্যকর্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত কবিতা সেই সিদ্ধিতে উপনীত হতে না পারছে ততক্ষণ সে কবিতাকে কবিতা বলা যায় না।

ত্রিশ বছর আগে বাংলা ভাষায় যত কবি ছিলেন এখন তার সংখ্যা দশ কি বিশগুণ যদি বেড়ে থাকে তবে আশ্চর্য হব না। এরা সকলেই কি কবি? সব পাঠকই তো কিছু না কিছু কবি। সব পাঠকই কখনো কখনো কবি। কবিতার লেখকেরাও সেই পাঠক মহাসংঘেরই সদস্য। অথচ পাঠকের সঙ্গে তার দুস্তর ব্যবধান যেন বাড়ছে ক্রমশই। পাঠক বলতে সাধারণভাবে শিক্ষিত যাদের বুঝি তারা ক'জন কবিতার এবং আধুনিক কবিতার পাঠক?

বিষ্ণু-দেকে তো এখনো বুঝি না—এমত মন্তব্যের মুখোমুখি এখনো হতে হয়। আধুনিক কবিদের শ্রোতা শুধু আধুনিক কবিরাই—এ রকম বাক্য শুনতেও আমরা প্রায়শ প্রস্তুত থাকি। জীবনানন্দ যখন জীবিত ছিলেন তখন তার বনলতা সেনের পাঠক জোটেনি, প্রকাশকও না। বন্ধুদের সৌজন্যে ক্ষীণতনু এক পয়সার একটি সিরিজে বনলতা সেনের আবির্ভাব এবং যথারীতি অনাদরে ও উপেক্ষায় অন্তর্ধান। ব্যতিক্রম ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য।

কবিতার সামাজিক চেতনাই সম্ভবত তার জন্য দায়ী। কবিতাও একটা আন্দোলন—সেও সমাজ অন্তর্ভূত। এই সত্য আমরা আবিষ্কার করি। সেই অর্থে সকল গদ্য রচনাও। গদ্যের একটা জনগণতান্ত্রিক চেহারা আছে। সে অস্পষ্টতাকেও স্পষ্ট চেহারায় তুলে ধরে। সেহেতু তার পাঠক বেশি। গৃহস্থের অন্দরমহলে সে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। কবিতার চেহারায় এবং বাক্য গঠনে যে মন্ত্রগুপ্তি আছে সেটাই তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার

থেকে বঞ্চিত করেছে অনুমান করি। কিন্তু এ সত্যও এখন হৃদয়ঙ্গম হয় যে কোনো কোনো ভাগ্যবান আধুনিক কবির কবিতার বইয়েরও চাহিদা আগেকার তুলনায় বেড়েছে।

এক সময়ে রবীন্দ্রবাবুর রমণীয় কাব্যসম্ভার সস্তায় বিক্রী হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপন বেরুত। ছেলেবেলার 'কথা ও কাহিনী'রই জনপ্রিয়তা বেশি লক্ষ্য করেছি 'সোনার তরী' অথবা 'বলাকা'র চেয়ে। এখনও রবীন্দ্রবাবুর 'পত্রপুট' বা 'শেষ সপ্তকে'র খরিদ্দার কম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্য তালিকা সেগুলোকে সচল রেখেছে। কবিতার প্রতি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যত অরুচি, কবিতা রচনায় সাধারণ শিক্ষিত তরুণের তত বেশি আগ্রহ।

এর কারণ কি এই যে বাঙালী কবিতা রচনায় আজন্ম প্রলুব্ধ? চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবাংলার গভর্ণর হয়ে এসে এক সভায় বলেছিলেন, পোয়েট্রি ইজ ইন বেঙ্গলস এয়ার। বাংলার বাতাসেই কবিতা; বাংলা কবিতা শুনে একথা তিনি বলেননি। তিনি শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান।

সেদিন একজন হিন্দী কবি আমাকে বললেন, আপনারা বড় বেশি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করেন। এই আচ্ছন্নতা না কাটলে বাঙালী কালচার ভারতীয় কালচারের সঙ্গে সমান আসনে বসতে চাইবে না। রবীন্দ্র উপাসনা বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা ভান। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধা বা দরদ নেই। যদি থাকত তাহলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীকে তারা এমন দুরবস্থায় এনে ফেলত না। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মধ্য-বিত্তের সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতার চূড়োয় পৌঁছুবার একটা মইমাত্র। তার বেশি কোনো প্রয়োজন বাঙালীর জীবনে ও কর্মে রবীন্দ্রনাথের নেই, যেমন নেই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যাকে বিদ্যাসাগর নামে সকলে চেনে।

কবিতার আন্দোলনেও বাঙালীর অন্তঃসারশূন্য সংস্কৃতিমনস্কতার দুর্বলতা প্রকট। বাঙালী তরুণেরা কবিতা নিয়ে ভাবেন, নিজেরা কবিতা রচনা করেন। কিন্তু বাঙালীর বাড়ীতে কবির আদর নেই। তারা উপন্যাসকারের নাম জানেন। কবির নাম রবীন্দ্রনাথ নজরুলের পর তাদের স্মৃতিতে একেবারে লেপা-পোঁছা। কবিতা রচনা করলে কবির স্ত্রী বা বান্ধবীও খুশি হন কিনা বলা শক্ত। কেননা তারা জানেন কবিতার কোনো বাজার নেই, কবিতার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়া যায় না এবং অনেকের

সন্দেহ কবিতা লেখার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকি কাজ করছে।

ষাটের দশকের কবি বাসুদেব দেব খুব সরলতার সঙ্গে বলেছেন, কবিতা লিখি আমার মধ্যবিত্ত অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে, আমার অবদমিত ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে, আমার আত্মাকে উন্মোচন করতে। প্রায়শই সেই ঘোষণা ব্যর্থ অংহকারের উচ্চারণে নষ্ট হয়ে যায়, সেই প্রকাশ-প্রয়াস বহুলাংশে ভ্রষ্ট হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্থূলতার কার্বনে, সেই উন্মোচন-আকাংখা অনেক সময় রূপান্তরিত হয় ব্যবহৃত শব্দরূপের অপরিচিত কুয়াশায়।

(ষাটের দশক ঃ ২)

একজন তরুণ, অত্যন্ত সফল গদ্যকার, আধুনিক তরুণ কবিদের উপদেশ দিচ্ছিলেন কবিতার সঙ্গে গদ্য লিখতে। গদ্য রচনায় একটা পরিশ্রমের ব্যাপার আছে। তিনি সেদিকটার ওপরেই জোর দিচ্ছিলেন। এত যে কবিতার কাগজ বেরুচ্ছে তার একটি কারণ বাঙালী তরুণ সাহিত্যযশোপ্রার্থীদের শ্রমবিমুখতা। কবিতাকে অশ্রমসাধ্য শিল্প মনে করে যদি সাহিত্যক্ষেত্রে কেউ আসতে চান তাহলে তার এবং বাংলা কবিতার উভয়েরই দুর্দিন।

শ্রম এবং সততা দুইই শিল্পকর্মের অপরিহার্য উপকরণ। বাংলা কবিতাকে জীবনের সমান্তরাল হতে হবে। সত্তর দশকের এক কবি আমাকে সেদিন গভীর বিশ্বাসে বললেন, জানেন, কবিতায় যৌনতায় আমি অবিশ্বাসী। যৌনক্ষুধায় কাতর যারা তারাই কবিতায় এইসব ব্যাপার লেখে। আমি কবিতায় একটা কিছু বলতে চাই—আমার জীবনের একটা ফিলজফি আছে। কবিতায় সেটা বজায় রাখার জন্য আমি খুব চেষ্টা করি।

তার কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হই। তবে তো হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। তরুণ কবি তুষার রায়চৌধুরীও এই কথা লেখেন, 'আসনে অর্ঘ্যানে খুলে দিই মুক্তির সঙ্গীত ; জীবনের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মাধ্যম করে তুলি ; মানুষের কাছাকাছি আরো যেতে হবে শিল্পকে ভালোবেসে।'

(অন্তরীণ, ১ম সংকলন মে' ৭৭)

বড় আশ্বাসের কথা একজন তরুণের মুখে। এর জন্য আমরা সর্বস্ব বাজি রাখতে রাজি। নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চস্তরে উত্তরণই একমাত্র পবিত্র অন্বিষ্ট। কবিতা কারো ক্রীতদাস নয়। এই অন্তঃসারশূন্য শ্রেণীভিত্তিক সমাজে কবিতা শিল্পও শোষকদের দ্বারা প্রলুব্ধ ও সতত বিপথে পরিচালিত হবার বিপদের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠীরাই শিল্পের প্রভু এমত ধারণা সাধারণ্যে

প্রচলিত। যেহেতু মাস্-মিডিয়া তাদেরই করতলগত। কবিতাকে পবিত্রতার উত্তরাধিকারে অভিষিক্ত করার ব্রত যাদের তারা এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। কোথায় কবিতা ছাপব, কেমন করে আমার পাঠকের কাছে পেঁছুব—এই প্রশ্নে নিয়ত আক্রান্ত হন তরুণ কবিরা।

প্রচলিত অর্থে জনপ্রিয় মিডিয়া সব শিল্পকর্মকেই দেউড়ীতে দাঁড় করিয়ে রাখে। গেটপাস না দেখালে প্রবেশাধিকার নেই। এবং সেখানে ঢুকতে গেলে বুকে হেঁটে কুর্ণিশ করতে করতে এগোতে হয়। কবিতা স্বাধীন এই কথা যাদের পতাকায় উৎকীর্ণ তারা পাল্টা শিবির বানিয়ে রণক্ষেত্র আগলান। পাঠকের কাছে পেঁছুবার দুর্গম পথ অতিক্রম করা এখনও বাকি। তুলসী মুখোপাধ্যায়ের জবানিতে শুনি একটা দৃপ্ত হাহাকার ঃ হায়রে বাল্মীকির উত্তরসূরী ; অপমান অবহেলা অপযশ অপঘাত প্রভৃতি সপ্ত শূন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়তে হচ্ছে অবিরাম। লড়তে লড়তে—পেছনে সরতে সরতে এখন দেয়ালে পিঠ দিয়ে ধুঁকছি। এবং বিশ্বাসঘাতক দেয়াল ক্রমশই হেলে পড়ছে নরকের টানে—যেখানে অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত শকুন।'

(ষাটের দশক—২)

কীভাবে উদ্ধার ? এই প্রশ্নই আজ সর্বত্র উচ্চারিত। কবিতার উদ্ধারের সঙ্গে সমাজের উত্তরণের সমস্যা পরস্পর জড়িত। একজন কবি নিজের সঙ্গে যেমন প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেন, তার যুদ্ধ পারিপার্শ্বকের সঙ্গেও। সামাজিক বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে শিল্প বৃথা। নাৎসী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে একদা টমাস মান, বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট প্রমুখ শিল্পীরা জার্মানী ত্যাগ করে বিদেশে প্রবাসে নিয়েছিলেন আশ্রয়। তাঁদের স্বাগত জানিয়ে ফ্রান্সের সাহিত্য আকাদেমি বলেছিলেন, আপনারা যেখানে সেখানেই জার্মানী। আমরা অন্য কোনো জার্মানীকে স্বীকার করি না।

আমরা কোথায় আশ্রয় নেব ? জরুরী অবস্থার সময়ে শিল্প, নাটক কবিতা বড় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তার প্রকাশের জায়গা ছিল না। তার আশ্রয় নেবার জায়গা ছিল শিল্পীর মনে, তার ক্ষোভে ও বঞ্চনায়। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা এবং সমাজব্যবস্থা যেখানে প্রকট সেখানে কবিতার বিদ্রোহ সব কিছু জীর্ণতার বিরুদ্ধে, অমানবিকতার বিরুদ্ধে।

কবিতাকে এখন নিজের পায়ের শিকল কাটতে হবে নিজেকেই। কবিতার প্রতি আনুগত্যের অর্থ তো শুধু এই শিল্প প্রকরণের প্রতি নয়, শিল্পের

যা অন্বিষ্ট মানুষের মহিমার প্রকাশ সেই মনুষ্যত্বের প্রতিই তার আনুগত্য অবিচল। বাংলা কবিতা তো জগৎ বিচ্ছিন্ন কোনো বিশেষ চীজ নয়, মানুষের মনন ও স্বপ্ন যা কিছু মহৎ যা কিছু শ্রেষ্ঠতর অর্জন করেছে তার উত্তরাধিকার নিয়েই বাংলা কবিতারও গৌরব।

যা মানবিক, সৎ এবং সাচ্চা, কবির কাছে তাই গ্রহণীয়। বাংলা কবিতার চর্চায় নিরত সহযোগীদের কাছে সেই মানবিক সুখ দুঃখের অংশীদারত্বই প্রত্যাশা করে আছি দশকের পর দশক। এক একটা দশক যেন আগ্নেয়গিরির এক একটা সোপান। গুহামুখ বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায় কম্পমান।

তাই কোনো নতুন কবিতার কাগজ বেরুলেই আগ্নেয়গিরির উত্তাপের জন্যই উন্মুখ হয়ে থাকি। বাঙালীর সংস্কৃতিতে বিস্তর গোঁজামিল চলছে। তার সাহিত্যেও আর একজন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মাল না। তাই অনাগত সেই কবির জন্যই আমাদের প্রতীক্ষা। আমাদের রচনা অসম্পূর্ণ, বিক্ষিপ্ত এবং অবহেলিত হলেও সেই মহান ঐকতানে হয়তো সে একদিন সুযোগ পাবে নিজের সুর মেলাবার। আজ যদিও বিষাদলিপ্ত কণ্ঠস্বর তার ঃ নেই কেন সেই পাখি।

———

ও গাছ, আমাকে নাও

গাছের ভিতরে যদি যেতে পারি একবার জীবনে
নিজেকে লুকিয়ে রাখতে, মুহূর্তের জন্যে হলে রাজি।
একটি মুহূর্ত আমি একা চাই, জল নয় কাঠ ও পাথরে
প্রতিশ্রুতিহীন কাঠ আমাকে নিজের করে নেবে।
বহুদিন থেকে এই সামান্য বাসনা নিয়ে আমি
জঙ্গলে গিয়েছি রাতে, অন্ধকারে। হারিয়ে গিয়েছি
কোনো শিকড়ের হাত ধরে যেতে চেয়েছি ভিতরে
—পথ আছে, পথিক একজন।
ও গাছ আমাকে নাও, মুহূর্তের জন্যে হলে নাও
তোমার ভিতরে আমি ধীর বেড়ে-ওঠা দেখে আসি।
পাথরের মতো স্তব্ধ তুমি নও, সম্প্রীতি রয়েছে
রস আছে, স্নেহ আছে, ভালোবাসা, বিবেচনা আছে।

ও গাছ আমাকে নাও, মুহূর্তের জন্যে হলে নাও

মানুষ যেভাবে কাঁদে

মানুষ যেভাবে কাঁদে, তেমনি কি কাঁদে পশুপাখি ?
একা থাকি বড়ো একা থাকি।
ভিতরে ভিতরে একা, অরণ্যের মধ্যিখানে একা
ঘরে ও বাহিরে একা, দিনে-রাতে, দুঃখে ও সুখে
ছায়া নেই, মায়া নেই, ফুলের বাগানে নেই ফুল
ঝর্ণার মতন ঢাল—পিঠ জুড়ে আছে এলোচুল
মেঘের সম্ভার আছে, জল নেই, জলজ উৎসব—
ধান নেই, টান নেই—আছে খড় শুষ্ক সন্নিপাত

পাতার, গাছের নিচে, পদতলে ভাঙনের মতো
এইসব শূন্য আছে এই দেশ পরিপূর্ণ করে।

তবুও মানুষ বাঁচে, মৃত্যু আছে বলে বেঁচে থাকে
মৃত্যু তো জীবন নয়, ধারাবাহিকতা নয় কোনো।
ভিড়ে বাঁচে, একা বাঁচে, মানুষের সমভিব্যাহারে
বাঁচে, বেঁচে থাকে—এই বাঁচতে হবে বলে থাকে বেঁচে—
মানুষ যেভাবে কাঁদে, তেমনি কি কাঁদে পশুপাখি ?
একা থাকি, তবু একা থাকি !

যেতে দিতে হয়

পুরোনো বাসাটি ছেড়ে হলো সাতদিন
নতুন বাসায় এসে গুছিয়ে তুলেছি
সামান্য, নিজেকে নয়, কিছু দেরি হবে।
সবকিছু ভরে নিয়ে, মনে হলো সব
নেওয়াই সম্ভব নয়, রেখে যেতে হয়
কিছুমিছু, গৃহের সামগ্রী নয়, গৃহের উপরে
হাওয়া, কোনো সুখস্মৃতি, দেয়ালের দাগ
এইসব।
এবার চুনকাম হবে, আমার স্মৃতির সব
লুকিয়ে পালাবে, সে তো রক্ষণীয় নয় !
রক্ষণীয় দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে এই বাসায় এসেছি
প্রথমটি বলে গেছে, বলেও যায় নি—
ঠিক কী কারণে কাকে যেতে দিতে হয় !

বিভাময়ী আলো

শরতের বিভাময়ী আলোর উজ্জ্বল রোদে
কখনো নারীর অভিমানের মতন মেঘ
জমা হয় আমার আকাশে, কালো ছায়া
নেমে আসে পৃথিবীর বুকে,
বিশাল দিঘির জলো অন্ধকার ছায়ায় তোমার
দুলে ওঠে মুখ,
পদ্মের শাপলার পাতা কাঁপে,
এই দিনের রাত্রির মধ্যে তুমি
ঝড়ের ছায়ার কোন্ নীরবে দাঁড়াও ?
চকিতে তোমার নয়ন তারায় কৃষ্ণ বর্ণ আলোর সমুদ্রে
আমার সমগ্র দেহ ক্ষুদ্র ছবির মতন তুলে
হেসে উঠলে একবার ঘাসের গোপন শিহরণে—

সন্ধ্যা হয়ে এলো, আকাশে চাঁদের পাশে
স্থির বিদ্যুতের রেখা, নীলিমার মেঘ বুকে ক'রে
ঘরে-ফেরা একটা উড়ন্ত পাখি ডেকে উঠলো

হোয়াইট হাউসে তখন নিউট্রন বোমার বাজেট তৈরি হচ্ছে—

তুমি দ্বার খোল

মেঘচুম্বিত ধারাবর্ষণ
দেশ থেকে আমি
এসেছি এখানে, চারিদিকে শুধু
সবুজ সবুজ—
শ্যামল ছায়ার সবুজ গন্ধ,

অগ্নিশিখার মতন ঘাসেরা
দিনে দিনে জাগে, বিচিত্র পাখি ডাকে দিনরাত
লতার মতন গোপন বেদনা
সমস্ত দেহে জড়িয়ে জড়িয়ে
কখন ছড়িয়ে পড়ে,
সমস্ত রাত নির্ঝর ব্যথা ঝরঝর একা
কেঁদে মরে ঘরে
পাহাড়ি নদীতে ঘোলাটে জলের
মত্ত ঘূর্ণি যৌবনের মতো ফুঁসে গজরায়
ঘুমুতে পারি না জাগতে পারিনা আবেশে কখনো
অদ্ভুত আলো বুকের মধ্যে ফুল হয়ে ওড়ে
পাখির পাগল কান্নার ডাকে,
উদাস হাওয়া মাটিতে লুটোয়
শরীরের থেকে কণ্ঠের শ্বাস জীর্ণ পাতায়—

আমার সে দেশের কোন ছাপ নেই আমার শরীরে
কোথাও বৃষ্টি অথবা রোদের গন্ধ নেই
এই পৃথিবীর বাইরের কোনো অদ্ভুত রঙ আমার রক্তে
আমাকে চেনে না, ঠাঁই নেই ঘরে,
বাইরে বৃষ্টি, আকাশের মেঘে ঘন বিদ্যুৎ—তুমি দ্বার খোলো।

তোমাকে দেখবো

হে মৃত্যু
তোমার চোখের কালো ঠুলি খোলো,
স্পর্শে তোমার এ কি বিদ্যুৎ তরঙ্গ,
আমার বুকের 'পরে তোমার দু'হাত,
দুই হাতে তুমি আমাকে তোমার বুকে টেনে নিলে—

অন্ধকারের নির্জন রাত গাছের পাতায়
পৃথিবী ঘূর্ণির তালে কাঁপে
পাতাঝরা শীতের রাত্রির আলো, সূর্যচন্দ্র ডোবে ;
পৃথিবীর আদিম ছায়ার আলো
আমার শরীরে এসে অবশ, শূন্যতায় শূন্য

আমাকে কেমনভাবে মৃত্যু তুমি ছুঁয়ে গেলে,
আমার চেতনা বিদ্যাবুদ্ধি সৌন্দর্য বাসনা
সুখের মদির স্বপ্ন শান্তি
কখন তলিয়ে যায় গভীর শূন্যের শূন্যে
এ কোন্ জগৎ, এ কি বসন্ত, না শূন্য থেকে
অদ্ভুত আঁধার আমাকে ভরিয়ে দেয়,
নিহিত গভীর কিন্তু আলো হয়ে উঠে আসে ?
নতুন মৃত্যুর জন্য ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
অন্ধকারের অনুপস্থিত হাওয়া আমার বুকের নীচে
সূর্যচন্দ্র সেখানে আঁধার মেলে দেয় চোখে ;
দিবস ও রাত্রি মৃদু ঝিনুঝিনু শিহরণে অবশ ব্যাকুল,
চুম্বনে কাঁপিয়ে তুমি অবগুণ্ঠনে দাঁড়িয়ে আছো—
ঘুমে জাগরণে চোখ মেলে তোমাকে দেখবো।

রাণুদি তোমার স্মৃতি

চণ্ডাল হাওয়ায় হালফিল কবিতার কাগজ উড়ে গেলেও তুমি
এখন তোমার বিশেষ দ্রষ্টব্য বুক ঢাকবার আর তেমন
প্রয়োজন বোধ করো না রাত দুপুরে অনায়াসে তুমি তোমার সমস্ত কিছু
বিলিয়ে দাও এক দখলদার পরপুরুষের কাছে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ছিঁড়ে গেলে
আজকাল চোখের জলে কে গেঁথে দেয় তোমার ভালোবাসার পুঁতির মালা

ঘামে ভেজা অন্ধকার ঘুমের ভেতরে
পুরনো প্রেসক্রিপশানের মতো সব প্রতিশ্রুতি ফেঁসে যায় সব স্মৃতি
ডুবে যায় বিকেলের উদাসীন ট্রামের শব্দের নিচে
এই অজন্মা আর দুঃখময় দেশে অনেক জন্ম
আমি অপেক্ষা করেছি আরো কয়েকটা বছর আমি
অপেক্ষা করতে পারবো
এই খরায় এবং খাদ্যহীনতায়

তুমি এখন তোমার প্রভুর প্রীতির জন্যে মানুষের দিকে পিছন ফিরে
হেঁটে যাচ্ছো লবণাক্ত সমুদ্রস্নানের দিকে আহা রোদ্দুর ঘ্রাণের সেই
বালক বয়স তোমার আঙুল ছেড়ে দিয়ে কবে
সংক্রান্তির মেলায় গেছে হারিয়ে…
এখন দিনরাত্রির দুঃখে সুখে তোমার বুক ধসে গেলে (হায় ধসে যায় যদি)
আমি দেখবো কে এঁটে দেয় তোমার নতুন ব্লাউসের পিঠবোতাম
গোধূলির বুক কাঁপানো আলোর ভেতর কে খুঁজে দেয়
তোমার গতজন্মের হারিয়ে-যাওয়া সেপ্টিপিন

রাণুদি তোমার স্মৃতি চোখের পাতার নিচে চরাচর
ভারাক্রান্ত মেঘলা দুপুর হয়ে আছে

ভালোবাসায় ফিরে এসো

ভালোবাসায় ফিরে এসো সমুদ্ররাতের নক্ষত্র
দিনরাত্রির শাখায় ফোটা ফুল
বুনোপাহাড়ের মাথায় ঘুরিয়ে ধরো জন্মদিনের আলো

শহরের লেনেবাইলেনে বিষাদে ও কার্বনে
খুব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা
পেতলের টবে প্লাস্টিকের ফুল
ভালোবাসায় ফিরে এসো দক্ষিণ সমুদ্রের নৌকো
কলকাতার ছলাকলা কি জেনে গেছে
লজ্জাভীরু অলকার মেঘ

কখনো রক্তের মধ্যে বসন্তের বাতাস
গেয়ে ওঠে রবীন্দ্রসংগীত
যন্ত্রণার বুক ছিঁড়ে উলসে ওঠে অকারণে কলকাতার হাইড্রান্টের জল
কখনো পায়ের নিচে শিউরে ওঠে ময়দানের মাটি
কুমারী মায়ের স্তনে জমে ওঠে আউসের দুধ
ভালোবাসায় একদিন কলকাতার সুন্দরী আকাশ হেসে ওঠে

একবার ভেবো আমাদের কথা

আমাদের কথা একবার ভেবো যখন আকাশের ওপার থেকে
হাজার হাজার মাইল রূপকথার গল্প সাঁতরে ভেসে আসবে
ছবির পাখিরা ফসলের ক্ষেত থেকে উঠে আসবে মানুষের
সব চেয়ে পুরাতন কথা ঝিঁঝি পোকা পৃথিবীর কানে কানে
শোনাবে পাঁচালি গান অন্ধকারে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে একবার ভেবো
আমাদের কথা

আমরা নদীর কাছে কোনদিন সান্ত্বনার বিকল্প রাখিনি
সম্রাজ্ঞী মায়ের স্তনে ছিল না দখলীস্বত্ব অংকুরের কালে
আকাশে লিখিনি আমরা এ জন্মের কুণ্ঠিত ঠিকানা
মাথায় রুমাল বেঁধে অন্ধকারে আমরা শুধু পার্কের ময়দানে
দুঃখী শব্দের মিছিলে তোমাকেই প্রদক্ষিণ করেছিলুম
বঙ্গীয় নিসর্গদৃশ্য আমাদের শৈশবের জন্যে
ঠাণ্ডা কচুরিপানার শয্যা পেতে দিয়েছিল
এ পটাফের মতো আমাদের শিয়রে জেগে থাকবে
পৃথিবীর পুরাতন ব্যথা···
আমাদের কথা একবার ভেবো

তুষার রায়ের জন্য

(ক) পুরোনো মুখ বিদায় নিচ্ছে, পুরোনো সেই মুখ—
ভোরবেলাকার স্মৃতিবাহী ইহজন্মের সুখ।
বিদায় নিচ্ছে দুঃখ-পাওয়া রাত্রিশেষের চাঁদ,
যায় না শুধু গাছগাছালির অনুষঙ্গ নিয়ে
অসম্ভব এই রূপনারাণের বাঁধ।

(খ) অনুতাপ নেই আর অভিমান নেই,
দু ফোঁটা চোখের জল আমাদের মধ্যবর্তী সেতু হয়েছিল,
সেতু নেই মাঝখানে চোখে জল নেই।

(গ) বহু চেষ্টায় আয়তে ছিল আকাশের নীল পাখি,
উড়ে গেল একা সারারাত ধরে সাগরের ডাক শুনে।
সারারাত ধরে শুনেছি কেবল সাগরের হাঁকাহাঁকি,
ঢেউয়ের ভেতরে ঢেউ ভেঙে পড়ে জ্যোৎস্নার গর্জনে।

শত্রুমিত্র-সংক্রান্ত

আমরা মদ খাচ্ছিলাম ঘাসের ওপর শুয়ে বসে, তিনপাহাড়ের গল্প করছিলাম। উত্তরের হাওয়া বইল একবার, আরেকবার দক্ষিণের। অবশেষে চারদিকের হাওয়া জড়ো হয়ে একটা ন্যাড়া শিমুলগাছের মাথায় নাচন শুরু করল, আমরা দেখলাম।

এমন সময় একটা লোক উঠে এল আমাদের মাঝখানে, মাটি ফুঁড়ে। গায়ে

জাম্বাজোম্বা, যেন শীতের ভয়ে আছে। পায়ে সেপাই বুট, যেন যুদ্ধে যাবে। মাথায় শিরস্ত্রাণ, যেন বাজ পড়ার আতঙ্কে কাঁপছে।

সে বলল, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছ তোমরা। তোমাদের চারিদিকে কেবল শত্রু আর শত্রু।

ভয়ে কাঁপুনি ধরে গেল আমাদের। আমরা সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম এদিক ওদিক। বললাম, শত্রু? শত্রু কোথায়?

সে বলল, একটা কেন্নো আছে এখানে, একটা মাকড়সা। একটা ইঁদুর আছে এখানে, একটা ছুঁচো। একটা আরশোলা আছে এখানে, একটা টিকটিকি। একটা বিছে আছে এখানে, একটা চামচিকে। একটা সাপ আছে এখানে, একটা ব্যাঙ। একটা পেঁচা আছে এখানে, একটা বাদুড়।...

বলা আর থামে না।

শত্রুর ফিরিস্তি শুনে আমরা আশ্বস্ত হলাম। শান্ত চোখে তাকালাম, ঈশ্বরের প্রতিবেশী এক নক্ষত্রের দিকে। গাছের মাথায় চলতে থাকল হাওয়ার নাচন। সে কি আবহমানের কালবৈশাখী?

এই স্বাভাবিক ভয় ও শত্রুতার ভেতর বাস করে আসছি আমরা দীর্ঘকাল। ভাবতে ভাবতে তিনপাহাড়ের অসম্পূর্ণ গল্পটা মনে পড়ে গেল আবার। মনে পড়ে গেল, তিনপাহাড়ের চূড়োয় আছে নীলচে রঙের গাছগাছালি। গভীর খাদে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল। ঐ জলে নিজের মুখ দেখতে পায় পূর্ণিমার চাঁদ, বাঘেরা দেখে ভয়ঙ্কর সূর্যোদয়।

গল্পটা শেষ হবার আগেই লোকটা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। গ্লাশে মদ ঢাললাম আমরা। সে কি জেনে গেল, জরুরী ভয় বলে আমাদের কিছু নেই?

পাহারা

এখানে আমার বাড়ি, আম-জাম-নারকোলের গাছ,
একান্ত পুকুরে খেলে ট্যাংরা, পুঁটি, সিঙ্গি, কই মাছ,
রান্নাঘরে খুন্তি নড়ে, পেয়ালা পিরিচে টুংটাং,
শোভন ড্রইংরুমে বাসি হাসাহাসি।

এসব নিয়েই আছি, এসবই আমার অহঙ্কার,
ঠোঁটের ওপরে নাচে, শব্দ নয়, সৌখীন মৌমাছি—
আমার অর্জিত সুখ এইসব, একান্ত আমার।

বাইরে যাওয়া হয় না কিছুতে,
বারবার কারো যেন নাম ধরে ডাকি;
'এই, কে আছিস, কে?'
ভেতরে পুরুষ এক সাড়া দেয়ঃ 'আছি আমি,
পাহারায় রেখেছি তোমাকে।'

যত বলি, বাইরে যাবো, এইসব থাকে যেন ঠিক।'
সে সতর্ক করে বলে, 'গৌরাঙ্গ ভৌমিক,
এসব তোমারই বস্তু, তুমি দেখো।' তাকে
দেখতে পাইনি কোনোদিন,
অথচ সে পাহারায় রেখেছে আমাকে।

কবিতা

তাহলে ফসল এখন

অরুণ মিত্র

ফসল ঘন হ'য়ে উঠলে
একবার সে মাথা তুলেছিল
যেন রাজা।
তার মুখে ঘামের ফোঁটাগুলো
ঝলমল করছিল,
ভরাট শীষের বাহার বুক পর্যন্ত।
তারপরই সে ডুবে গেল
আর উঠল না।
তবে কি তার পায়ের কাছে
ফাঁদের মাটি ছিল ?
সে ছেলেমানুষের মতো
সেখানে ভর দিতে গিয়েছিল ?
তাহলে ফসল এখন লোপাট হবে,
আমাদের সামনে নিশ্চয় আকাল।

পতিত পাবনের রোজনামচা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

রাত্রির বারটা বেজে এসেছে।

ভাঙা টিনের আটচালায়
দরিদ্র প্যাঁচার মত বসে
শেষ রাত্তিরটা।
বাঁকা লাঠি। যক্ষার কাশি।
রাতচরা নাইট্‌জারের ডাক
চক্‌ চক্‌ কটর্‌র্‌।

রোজনামচার পাতায়
আর একটা দিন উঠে আসছে
অনিবার্য সূর্যচেতনা নিয়ে।
দরজা আগলে বসে থাকবো,
ঐ সুদখোরটা এই পথেই ফিরবে।

বুঝলে হে ভায়া ;
আমাদের আশপুরুষেরা বেয়াড়ারকম
স্বার্থপর, কুটকচালে।
সব কোলের দিকে ঝোল।
আর অন্যের বেলায়—
মরণ রে তুঁহু মম।

তা না হলে ঐ সুদখোরটার মত
আরও সহস্র সহস্র ছুঁচো, বিছে সাপ
হাঙর কুমীর সদৃশ সব মানুষেরা
প্রত্যেক দিনের আসরে উদ্ধত-গুমফ
চলে ফিরে বেড়াতো না।

কালো বাজারের বেরাদারি করে
ওয়াগন্‌ মিটিং স্ট্রাইক ইত্যাদি ভাঙার
ঐতিহাসিক পরওয়ানা নিয়ে
আমাদের জন্ম কর্ম আহার বিহার।

তাই বলছিলাম,
প্রতিটি দিন গিয়ে রাত্রি আসবে
বার বার রোজনামচার পাতায়—
অভ্যস্ত সেলামের মত।
কিন্তু সেলাম করেও শান্তি নেই ভায়া।
কারণ, কেউ ভুল করতে করতে ঠিক করলো,

ঠিক করতে করতে ভুল করলো—
কেউ থির জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।

পীঠ নেই। পাঠ নেই। ঠাঁই নেই। ঠাট নেই!
আবার দেখবে, ভুতুড়ে ছায়ারা
কোনার দিকে মুখ ফিরিয়ে
বিড় বিড় করে যুদ্ধের মন্ত্র আউড়ে চলেছে।

কিন্তু তোমায় সাবধান হতে হবে ব্রাদার।
জেনো, তোমার উজ্জ্বল পূর্বপুরুষেরা
জয়ধ্বনি করেছিলেন একদিন—
এই আলোকিত জন্মভূমি পাহাড় প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে।
এখন তাঁরা রক্তেও অনুপস্থিত।

তাই সাবধান হতে হবে।
তোমার প্রেমকে, সোনালী শস্যকে
আগলে রাখার জন্যে
গ্রামের সমস্ত শিশুদের আগলে রাখার জন্যে—
একটা অসমাপ্ত কবিতাকে সমাপ্ত করবার জন্যে,
মনে প্রাণে শরীরে সশস্ত্র হতে হবে।

ওই দেখো, আবার ঐ ভুতুড়ে ছায়ারা
বিড় বিড় করে মারণ মন্ত্র আউড়ে
তোমাদের দিকেই আসছে।
এইবার, বজ্রমুষ্টি।—আস্তিন্ গোটাও।

সেই যে কথাগুলো
দু'বেলা মরার আগে
মরবো না ভাই মরবো না
সেই যে কথাগুলো
ধোপদুরস্ত কথা হয়েই থাকলো
সত্য হল না

আমি প্রতিমুহূর্তে নিজের মৃত্যু দেখে
প্রতিদিন নিজের শব কাঁধে করে
নিমতলা ঘাটের দিকে যেতে যেতে
প্রতি সন্ধ্যায় নিভন্ত চিতায়
এক কলসি জল ঢেলে দিতে দিতে
এই যান্ত্রিক পৌনপৌনিকে
ক্লান্ত
জীর্ণ
অবসন্ন
হিম হতে হতে দেখি
আমি ঠিক মরি নি তখনও
আমার হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির ঘা
কাঁজর ঠিক নিকটে
চামড়ার ভিতরে সেই বন্দী ঘোড়াটা
সামনে পা আছড়ে ডেকেই চলেছে

ভাবলাম
আমার সব ভাবনার মতো
এই ভাবনাও ভুল

আদত কথা হল
কোন আয়নায় তুমি মুখ দেখছো

নিজেকে ঠিক কোন প্রেক্ষিতে স্থাপন করে
নিজের ছবিটা আঁকছো
আদত কথাই হল
কোন বীজ তুমি রোপণ করেছ ধ্যানে ও চেতনায়
ইতর না নৈতর ?

ভয় ?
সবচেয়ে বড় ভয় মুছে যাওয়া—এই তো
সবচেয়ে বড় ভয় চোখের বাইরে যাওরা—এই তো
সবচেয়ে বড় ভয় ডাকের সাড়া না পাওয়া—এই তো !

কাল যে বৃষ্টির বড় বড় দানা ছড়িয়ে পড়েছিল মাঠে
আজ সকালে তাদের দেখতে পেলে না বলে মুছে গেল
সে কি পরিবর্তিত সত্তায় ক্রিয়াশীল নয় অবুঝ শিকড়ে ?

কতদূরে যেতে পারে তোমার দৃষ্টি ?
কোটি আলোকবর্ষ দূরে শীতল নক্ষত্রের কাছে
তোমার দৃষ্টি আটকে যাবে ওই নীলিমার পাঁচিলে
তারও ওপারে যে যোজন যোজন নীলিমা রয়েছে, তার কি !
তাদের গলার স্বর কিন্তু তুমি শান্ত হলেই টের পাবে
তোমার বুকের মন্দিরে বাজছে
ছলাৎ ছলাৎ করে জলতরঙ্গের সুরে বাজছে।

আদত কথা হল
আমাদের যে অজস্র সত্তা আছে
তার অন্তত কয়েকটিকে ঢালাই করা চাই শুদ্ধতায়
যেন তারা নমনীয় হয়, নৈর্ব্যক্তিক হয়
যেন আত্মত্যাগ, আত্ম-বিস্মৃতি, মৈত্রী ও নম্রতায়
প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুভব করা যায়
সেই এক, প্রবহমানতা
যার নাম প্রোজ্জ্বল জীবন

ভয়ের সাম্রাজ্য তখনই জাঁকজমকে ভরে ওঠে
যখন ভাবি পৃথিবীর সীমা হল আমার দেহ
ইতিহাস হল আত্মরতি
জীবন আমার বুকের ধুকপুকানি ; যখন
বস্তুর সত্তার ওপর আরোপ করি বিকৃত অহং

তোমার চারপাশের দড়িগুলো কেটে
নিজেকে একটু সহজ করে নাও
দুপুরের সিংহ সূর্যকে বসাও বুকের মাঝখানে
আর নীরব প্রসন্নতায়, দহনে দীপনে
নিজেকে স্থির করে ফেলে দাও তার পায়
যার নাম প্রোজ্জ্বল জীবন

সংসার

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বেশ হয়েছে, মুখ থেঁতলে পড়ে আছো, চোখের কোণে কালি, জানছ না স্বপ্নকে নির্বাসন দিয়েছে তোমার শয্যা থেকে ঘর থেকে, নিজেরি অন্তরের অন্তরীক্ষ হতে, শুধু শুঁড়ির দোকানে ফিরে-ফিরে আসা মাতালের মতো ইচ্ছার অভ্যাসটাই দেহে উনুন হয়ে জ্বলছে, সাপ কিলবিল করছে শিরায়, তাই দেখারও শক্তি নেই তোমার

সংসার পেতেছ যা-কিছু নিয়ে এই ঘরে, দেয়ালের ছবি বা কুলুঙ্গির কৌটো, সবই একই অভিজ্ঞতার পুনরুক্তিতে এবার ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ছে. মুখে-চোখে তাদের শপাং-শপাং চাবুক, উরুতে কালশিরা, যা ছিল একদিন গীতি-কাব্যের কলি, প্রতি চরণে ছন্দ, ঘাড়ে গোধূলির ময়ূর,

আজ তা রসকষহীন ডাঁটার ছিবড়ে।

তবু যারাও, তোমারই মতো, যেহেতু অভ্যাসের মদ গিলেছে বসে-বসে, তাই চাইছে আজও আমি করি যা করতে রোজই আসি ঘরে।

দোষ তোমার নেই, তাদেরও নয়, হয়তো আমারও নয়—কিন্তু খেলার একাধারে নায়ক-প্রযোজক-পরিচালক বলেই আমি যে জানি মুক্তির জন্য চাই-ই চাই, শুধু লাফই নয়, একটা সিঁড়িতে ওঠা, একমাত্র যেখান থেকেই সম্ভব উচ্চারণ বা তাকানো নতুন চোখে।

ভুলে গেছ, তুমিও একদিন দৃষ্টি চেয়েছিলে।

আজ তাই এসেছি ফিরেই যাব বলে, কিছু না করে, কঠিন চোখে দেখতে নেশার খাদ্য না-পাওয়ায় তোমার ছটফটানি, দেয়ালে-দেয়ালে ছবিগুলোর দাঁত-কিড়মিড়। যাবার সময় দরজা ভেজাবে না, যাতে তোমরা যারা কিছুতে বেরোবে না, শুধু আমারই গায়ে-লাগা হাওয়া শুঁকবে বসে-বসে, তারাও পাও বনানীর সংকেত, যাতে অন্য মানুষের গ্রাম উটকো ঝড়ে দুটি-একটি বিচ্ছিন্ন কথা রেখে যায় তার সুখদুঃখের—দরজা খোলা থাক, অন্তত ততদিন যতদিন-না আবার ফিরে আসে রঙ ঘরে।

আমি অবশ্য যথারীতি আসতেই থাকব, রোজই সন্ধ্যায়, নেশার খাদ্য যোগাতে নয়, শুধু উস্কানি দিয়ে নেশাটা জীইয়ে রাখতে, তবু বললামই তো, চাই-না চাই-না দেখতে আর উরুর কালশিরা, চোখের কোণে কালি, ডাঁটার ছিবড়ে।

সব দাগ মুছে গেলে শপাং-শপাং চাবুকের, নিশ্চয়, আবার খেলব।

সেই পাখি

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

পড়ন্ত দুপুরে জ্বর ছাড়ে শরীর ঘামায়,
পাশেই ছোট্ট জানালা আমি দেখতে পাচ্ছি একটুকরো আকাশ
চেপে আছে টুপীর মতন দশতলা বাড়ির টেকো মাথায়।

কোথায় কাঁঠালীচাঁপা গাছ ডোবা পুকুর এক চিলতে সুপুরি বাগান,
সেই পাখি হয়ত আর দেখব না কোনদিন।
পুবে ঠাকুমার ঘর আলসেমির দুপুরে শুয়ে ছোট্ট জানালায় চেয়ে থাকা
কখন আসবে উড়ে নীল বুটিদার সেই পাখি
ডানার বেদনা ঝেড়ে হঠাৎ জুড়বে কোনও গান।

টেলিভিশনের এ্যানটেনা মসৃণ রুপালী টান টান
সৌন্দর্য দেখার সুখে চেয়ে থাকি হঠাৎ অস্থির করে প্রাণ
ছোট্ট পাখি এ্যানটেনায় উড়ে বসে আমাকে তাকিয়ে দেখে নাকি
শুধু আমি জানি আর জানে সেই পাখি।

কাঁঠালীচাঁপার গাছ হঠাৎ মেলল তার ঝাকড়া ডালপালা
দশতলা বাড়ীর মস্ত ছাদে রিক্ত আকাশ ভরে
প্রথম দিনের মত একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে
গেয়ে উঠল নীলবুটিদার পাখি তেমনি সুরে।

ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী

শিবশম্ভু পাল

চৌকাঠ পেরিয়ে দেখ ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, শালিকের বেহায়া যুথমতা
চেয়ে দেখ বিজ্ঞানের অভিসন্ধি, অশ্রুপাত, কাঁচের যুবতী
তোমারই আঁখির আগে প্রতীক্ষাচঞ্চল কিছু তরঙ্গের ক্ষণিক সংহতি—
তারপর চলে যেও সীমাবদ্ধ তমসায় ; গুহার ক্ষমতা
কম নয়, সেখানেও বিশ্বাসনিয়ন্তা তীব্র ক্রীতদাস প্রথা,
রয়ে গেছে ন্যূনপক্ষে কণিকার ডিস্কের খাপ, সন্তানের প্রতি
গম্ভীর দায়িত্ব, তুমি সরলের অঙ্ক পারো, বাঁচাও প্রগতি
অলিখিত ব্লাডব্যাঙ্কে। এও এক পরিত্রাণ কিম্বা ধার্মিকতা।

চৌকাঠ পেরিয়ে দেখ, দেখাটাও অন্যতম জরুরি বিধান
চেয়ে দেখ শালিকের অসামান্য বোঝাপড়া সাহসী শৃঙ্গার
মেঘরৌদ্রবাতাসের দ্বন্দ্বেদ্বন্দ্বে সহযোগে চূর্ণ কারাগার
অপরাহ্নে জনস্রোতে ভেসে যায় অশ্রু আর হাস্যে ব্যবধান···

তুমি একটু দেরি করে বাড়ি ফের ; এইসব লীলা ভ্রাম্যমাণ
চোখের পাতার নিচে এনে দেবে মধ্যরাত্রে অনন্য পাহাড়।

বনমহাল

রঞ্জিত সিংহ

চিতল হরিণ-কচুপাতার আড়ালে
আদ্যিকালের কলসিভুড়ির ঠাকুর্দা ব্যাঙ
গিটকিরি মারছিল।
জন্মাষ্টমীর সারাটা দিন বৃষ্টি।
লম্বা গোল মাথা সিজপাতা, শশাপাতার লতানো জালে
হরিৎ বৃষ্টির শ্রাবণ কাঁপছে।
ডুমুরে-অশ্বত্থে-বটে অন্ধকার নিশ্ছিদ্র সন্ন্যাসী-জটা,
অবাস্তব জলভ্রমি।
ঝিরি শব্দে ঝিঁঝি ডেকে ওঠে।

অনেক বছর আগে এই সন্ধেবেলা
ডগডগে লালটিপ, টকটকে লালশাড়ি
ঈশানী ভুরুতে মেঘ—সে চিৎকার করে উঠেছিল ঃ
আমাকে বাঁচাও—ঐ ঘোর সন্ন্যাসী-জটা—
তাতে আমি ফেঁসে যাচ্ছি···

আজ সেই জন্মাষ্টমীর বিকেল। শ্রাবণের ঘন জল।
পা দুটো ঝুলিয়ে অশ্বত্থের ডালে লালটিপ—লালশাড়ি
আমাকে দেখেই হেসে ওঠে—হা হা হাসি
শিমুল তুলোর মতো চতুর্দিকে ভাসে।
হাসতে হাসতে বলে—
বনমহালের ভৈরবীচক্রের নিশিটান থেকে
আমাকে বাঁচাতে একবার চেষ্টাও করনি···

লাল অপরাহ্ণ তখন হালকা ফুরুশফুলের মতো
খসে খসে ভাসতে ভাসতে আমাকে জড়িয়ে ফেলে।
আর খুব কাছে আদ্যিকালের ঠাকুর্দা ব্যাঙ
কটরমটর গলা কটমটাচ্ছিল।

জানি

গৌতম গুহ

ধুলোভরা এ পৃথিবী থেকে ছুটে এসে দেখি সবুজপাতার নিচে
মেধাবী মহিলা,
আমার পৃথিবীর দিকে না চেয়ে না ক'য়ে চলে যায়।
সে ও তার প্রখর বালক কোন শ্যামমাঠে
লোফালুফি খেলে
সফলতা ?
এইসব অস্বীকার করে কতদূর যায় ?
আমায় উপেক্ষা করে অন্তত এখন একটি পাখিও ডাকে না
ধুলোভরা পৃথিবীর যা কিছু পছন্দ সুর গান
আমার কল্পনা
অজ্ঞাত মাটির পথে রাশিরাশি প্রতিভার ফুল

আমায় উপেক্ষা করে অন্তত এখন, একটি বসন্তও আসে না।

মুক্তবন্ধ ছন্দ চাই

রবীন সুর

অথচ থিতোতে চাই—উড়ন্ত খাতায় লেখা
এলোমেলো ভাষায় বর্ণনা
যথাযথ অক্ষরে ফোটে না,
হরিণ পিপাসা
অরণ্যের নিরাপদ অঞ্চলের সীমায় ঝর্ণার
জিব রাখলে ওৎপাতা
ক্ষিপ্ত বাঘের হুংকার
অনায়াস নাগালের জবুথবু শিকারে ঝাঁপায়!

সিসমোগ্রাফে ঢেউ সংকেত না-দিয়ে
চৈতন্যের দিগ্বিদিকে স্তরে স্তরে গুপ্ত আলোড়ন
কখন কোথায় জাগে ভূমিকম্পে তীব্র জলোচ্ছ্বাসে
ঠিক এপিসেণ্টারের হদিস মেলে না!

জেগে নেই তবু যেন ঘুম নয় নার্কোটিক আচ্ছন্ন তন্দ্রায়
কোথায় কখন
স্বপ্নের সুষমাগুলি সুতৃপ্তির পাখনা ছড়ায় ?

ক্রমশ উজান বেয়ে গুণ-টানা দিন ঃ
কেবল বন্ধন
মুক্তি নেই মুক্তবন্ধ ছন্দবন্ধে, সময় ঘোলায় !

অশ্রুমুখী

সুচেতা মিত্র

সেখানে কোন ছায়ায় ছিল অশ্রুমুখী ঘর—
শ্যাওলা-ধরা ঘাটের কোণে পাথর জমে আছে
কি চাই বলে হাত বাড়ালে জলের কোমল স্বর
গা ঘষেছে গলার নিচে মেঘের মতো সুখে।

এখানে নেই নীলাম্বরী। দৌড়ে আসে ট্রাম
চাকার ঘষায় মুখ বাড়িয়ে হায় কি হারালাম !
এ এক গোপন অনাবৃত অশ্রুমুখী ঘর
বুকের ভেতর আচমকা চিড়—প্রদীপ নিভে যায়।

মনকে করে অশ্রুমেখী—শ্যাওল ধরা স্মৃতি
কঠিন এমন অনুশাসন, হারানো উদ্ধৃতি।

দোলনচাঁপার বীজ

প্রদীপ রায়চৌধুরী

বৃন্ত ঘিরে স্থির থাকে প্রকৃতির আমন্ত্রণগন্ডী
এটা জন্মগত স্থিতি
গর্ভবতী ঢাউস চাঁদ দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যে
রেখে গেছে বর্ণময় আরও কিছু নিজস্ব মুদ্রা
দাগ অনুরাগ
চোখের পাতায় কাঁপে প্রজাপতি স্মৃতি
রমণী স্থির হতে বুক রাখে ছাদের কার্ণিশে

আর্টস্কুল ছাড়াই যেমন অনেক শিল্পী
শিখে যায় অনুপম রঙের বিস্তার
দোলনচাঁপার বীজ তেমনই নির্জন ভূমিতে রাখে
উদ্ভিন্ন সুখের বুনোট
অথচ রমণী জানে না এই সব পরকীয়া সুখ
একদিন হয়ে যাবে নিটোল যন্ত্রণা
মানুষের শিরার মতো নীল হবে প্রৌঢ় সন্তাপ
কেননা প্রতিদিন রূপবান গুহাচিত্রে সযত্নে চুমু খায়
লুব্ধ নশ্বরতা
এইসব দৃশ্য থেকে রমণী দূরে রাখে মোহগ্রস্থ চোখ
তবু বহুদিন পর বৃষ্টির কাছে
যেমন নত হয় প্রথম সবুজ কলাপাতা
তেমনই আনত হয় তৃষ্ণার্ত রমণীর গ্রীবা
পর্যাপ্ত সোহাগে

দুই ভয়ঙ্কর দানব

কমল তরফদার

জাতি বলতে আর কিছু নেই,
আছে তিন-চার রকমের মুখ আর চামড়া ;
পৃথিবীর জল স্থল জুড়ে
দৌড়ে বেড়ায় স্ত্রী পুরুষ
দুই ভয়ঙ্কর দানব।
কথা বাড়িও না,
পোশাক পরিচ্ছদে তুমি আন্তর্জাতিক,
চুপচাপ খেয়ে যাও ডাইনিং টেবিলে।
সকালে হাতে নিয়েছিলে তীরধনুক,
রক্ত ধুয়ে ফেললেও আছে গন্ধ ;

ঠিক ক'রে বল আর কোন্‌খানে রক্তপাত
ঘটিয়েছিলে, কতগুলি বুকে বসিয়েছ দাঁত,
কতবার আইন এবং বিশ্বাস ভেঙে
লাগিয়েছ স্বর্গীয় মুখোশ ?
বাঙালী ভারতীয় অথবা আন্তর্জাতিক
তোমার ঠোঁটে মিথ্যাপ্রচার
আলপিন ফোটালে মুহূর্তে হয়ে যাবে
ওরাংওটাং।
পরিচয় শুধুমাত্র স্ত্রী পুরুষ
দুই ভয়ঙ্কর দানব
নিষ্ঠুর এবং বন্য অকৃত্রিম।
চুপচাপ খেয়ে যাও ডাইনিং টেবিলে।

সময় হলে

দীপক কর

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে
একটু সময় লাগে
নড়ে

বস্তুতঃ পৃথিবীটা ভয়ঙ্কর ভারসাম্য গ্রহ এবং
সময় তার-ই নিজস্ব দর্পনাশা নদী
সে এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে

মানুষ বোঝে না এ-সব কথা
সে আস্ফালন করে কেবল আস্ফালন করে
তার মাত্রাহীন মাত্রাহীনতা একসময় কালাপাহাড় হ'য়ে
পদাঘাত করে মনুষ্যত্বের মর্মমূলে

অথচ সময় পৃথিবীর নিজস্ব প্রতিনিধি দর্পনাশা নদী
তিরতির তিরতির কাজ করে যায়

তার নির্ভুল রায় এক সময় ঠিক কেড়ে নেয়
পদতলে উদ্বৃত্ত সবটুকু মাটি

পৃথিবীটা ভয়ঙ্কর ভারসাম্য গ্রহ হে

ধর্মের কল নড়ে

সময় হলে-ই নড়ে

দুটি তাঁবু

স্বপন রায়

আমি এই উদাসীন মাঠে দুটি তাঁবু ফেলেছি,
একটি তাঁবু
ফসল ভরা মাঠের মত উজাড় করা স্বপ্ন,
বুকের গভীর শেকড় বাকড়,
শুধু দিব্য আনন্দে পায়ে হেঁটে চলা তপোবন
যেন আর এক অন্য কোনো গ্রহ !
আমার মায়ের কোলে শুয়ে এক ঝাঁক পায়রা ওড়া দেখা

আর একটু তাঁবু
আমি ঘৃণায় শানাচ্ছি ছুরি
কোমরের বেল্ট হাতে দাঁড়িয়েছি মস্তানের মত
মৃত্যুকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বমি করছে
জীবন আর জীবন।

শালা, সব সাফ্।

কেননা প্রথম তাঁবু আমাদের
প্রাণভোমরা
এ তাঁবু আগলাতে তাই নিজেরাই সমিধ্।

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা

পরাভব

এই ঘর নারী খামার
সবই তুমি একদিন ছেড়ে চলে গিয়েছিলে
কবিতার জন্য
পথে-বিপথে ঘুরতে ঘুরতে
তোমার কামিজে লেগেছিল গেরুয়ার ছোপ
বন থেকে বনে
জলপাই রং ধরেছিল তোমার ট্রাউজার্সে
তুমি অভিশপ্ত
বন্ধুদের কাঁধে কাঁধ চৌমাথার মোড়ে
দাঁড়াতে পারো নি কতকাল
প্রিয় নারী আর দেশের ভিটে ছেড়ে
নারী আর দেশকে নিয়ে
তুমি পদ্য লিখতে চেয়েছো কতকাল…

বাবলা কাঁটায় গাঁথা তোমার হৃৎপিণ্ড
প্রতিটি কর্কশ পাথরে তোমার চোখ
আকাঁড়া আবেগের কাঁচা বর্ণমালা
সব কিছুর ওপর এখন লেগেছে
হাওয়া ধুলোবালির উদাসীন হাত
এত অধীরতা নিয়ে
শেষ-মেশ কোথাও পৌঁছতে পার নি তুমি
আজ তাই যাবতীয় ড্যাশ কমা
প্রতিটি অক্ষর ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে
তোমার চারপাশে
খানখান ভেঙে পড়ছে সমস্ত বিখ্যাত উপমা
স্তবকের পর স্তবক সাজিয়ে

একটির পর একটি বাড়ি তুলছে নতুন স্থপতিরা
দারুণ দুঃখের ভিতর
দারুণ দেরিতে
ঘুম ভেঙেছে তোমার
তুমি কিছু চিনতে পারছো না
কেউ চিনতে পারছে না তোমাকে
তোমার পাথর-চাপা পদ্যে
বুটের পেরেক ঠুকে নিচ্ছে অহংকারী তরুণেরা
যুবতীদের খলখল হাসির ভিতরে
বসে আছো অধীর লিঙ্গহীন দেবতা
আর
যখন কমা সেমিকোলন-সমেত প্রতিটি অক্ষর
অনিবার্য ছুটে আসছে তোমার দিকে
উঠোন থইথই করছে
ডগমগ শব্দে, উপমায়
তোমার ঘুমভাঙা-জলকষ্ট
আকাঁড়া-আভাঙা অভিমানী সমূহ বর্ণমালা…
একটাও কবিতা লিখতে পারো নি তুমি
সকল মুকুল ভেবে
বুকের নিবিড় তাপে
বিষের গোটা তুমি ফুটিয়ে তুলেছো
কতকাল…কতকাল…

কবিতা কল্পনালতা

একটু আধটু সত্যি এবং বাকিটা সব মিথ্যে কথার
রঙিন সুতোয় জড়িয়ে আছেন কবিতা কল্পনালতা।
এই সুতোতে বন্দী তুমি, অল্পে অনেক কষ্ট পাচ্ছো,
কিংবা দুঃখ—আঙুল তুলে যাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছো,
চিতার ওপর পড়ছে শরীর অর্থবিহীন স্তাবকতায়,
হরেক সুতোয় জড়িয়ে আছেন কবিতা-কল্পনালতা।

মেঘ জমে ঢের বয়স হল। এখন কোথায় হাত-পা ধোবে,
পণ্ডশ্রমের চুকিয়ে পালা একটু-আধটু মদ্য খাবে,
না হয় যাবে অনন্তপুর ইচ্ছেমাফিক সকাল দুপুর,
ছন্দমিলের হাজার ডাকেও করবে না আর হন্ত উপুর,
আদিখ্যেতা অনেক হল, এবার না হয় বর্বরতা—
কাঁথার ওমে জড়িয়ে তবু কবিতা-কল্পনালতা।

এই খেলাতেই নষ্ট তুমি। ভরদুপুরে পুরো অন্ধ ;
পাথর শুঁকে অলীক ঘ্রাণে দুরন্ত চম্পকের গন্ধ।
শীতের রাতে জমাট হিমে সেঁকছো হাতের পায়ের কাঠি,
এক নিমেষে করছো সাবাড় দুধ বলতে বিষের বাটি,
রঙ্গপ্রবণ হাটের মানুষ ভীড় করে সব দেখতে যাচ্ছে,
কে সেই আহাম্মুকের রাজা—পদ্য লেখার কষ্ট পাচ্ছে ?

কবি

পদ্য ছাপা শার্ট গায়ে
পদ্যের বইয়ের দুটো মলাটের মধ্যে
শুয়ে আছে কবি।
তার শরীরের ওপর
কিছু তরুণের রোগাটে আঙুলের কাঁপাকাঁপি,
নির্বাক উই-এর সরু চলাচল,
আর তার প্রিয় নারীর
লাফিয়ে পড়া চুলের কালির সঙ্গে
মিশে যায় নীল লেডের বিষ,
কিছু বর্ণমালার ফাঁকে ফাঁকে
টুপটাপ ঝরে যায় মধু শিশির ঝর্ণা…

পুস্তানির কাঁথা মুড়ে
পদ্য-ছাপা শার্ট গায়ে
দুটো মলাটের মধ্যেও
সারাজীবন শীতে হি হি কাঁপতে থাকে কবি।

ট্রিওলেট

।। এক ।।

স্বপ্নে তুমি ছুঁয়েছো অন্তর,
জাগরণে এইতো আমার সুখ।
রূপ-নগরে বেঁধেছি আজ ঘর,
হঠাৎ রাতে সরব যদি ঝড়—
ক্ষত বুকের রাখবো কোথায় দুখ ?
স্বপ্নে তুমি ছুঁয়েছো অন্তর,
বুকে আমার রেখেছিলে বুক—
জাগরণে এই তো আমার সুখ।

।। দুই ।।

তোমার সঙ্গে হয়েছে ঢের কথা,
তবু কথার হয়না কেন শেষ ?
বাড়ছে কেবল বুকের করুণ ব্যথা,
তোমার সঙ্গে হয়েছে ঢের কথা,
তবু কথায় লাগছে কেন বেশ ?
ইচ্ছে করে জড়িয়ে তনুলতা
ছড়িয়ে পথে মনের প্রগলভতা,
খাঁচা ছেড়ে হই যে নিরুদ্দেশ।

।। তিন ।।

পয়োধরে লেপিত চন্দন,
দেখে সেই সাবেক সুন্দরী।
চারিদিকে গন্ধরাজ বন—
যেন তার অনুগামী মন
আকাশে ওড়ায় নীল ঘুড়ি।
দেখ সেই সাবেক সুন্দরী,
উন্মোচিত সরোবর-স্তন,
স্নিগ্ধ করে তৃষিত মনন।

॥ চার ॥

দেখেছি বসে ট্রেনের থেকে ছবি,
সামনে জল, পেছন জুড়ে স্মৃতি ;
দিয়েছিলেম তোমায় আমি সব-ই,
বুকের থেকে নিঙড়ে নিয়ে প্রীতি।
ট্রেনের থেকে দেখছি বসে ছবি,
শূন্য হৃদয় সব হারিয়ে কবি,
করি না আর তোমার অনুসৃতি—
তোমার জন্যে বাড়ছে তবু প্রীতি।

॥ পাঁচ ॥

কাছে এসে তবু চলে গেছো বহুদূরে,
শরীরের ঘ্রাণ রেখে গেছো চারপাশে।
উতল বাতাস সেই থেকে একই সুরে,
জানিনা কেন যে সারাটি হৃদয় জুড়ে
পেয়ে হারাবার সকরুণ উপহাসে
হানছে আঘাত। চলে গেছো বহুদূরে।
শরীরের ঘ্রাণ রেখে গেছো চারপাশে,
এখনো হৃদয় তোমাকেই ভালোবাসে।

॥ ছয় ॥

ফল কি ফুলের চেয়ে দামী ?
প্রশ্ন করে ভ্রমর চঞ্চল ;
আমিতো ফুলের অনুগামী।
চাইনা রঙীন স্বাদু ফল,
তৃষ্ণায় এখনো খুঁজি জল—
ফল কি ফুলের চেয়ে দামী ?
চারিদিকে ভোরের উজ্জ্বল—
আমি তো ফুলের অনুগামী।

প্রেম

একদল অশ্বারোহী শত্রুর আচমকা আক্রমণে বিধ্বস্ত শহরের
ধ্বংসস্তূপের তলায় এখনো পড়ে আছে
আমার তৈরি অনেক রাজপথ
শয্যাগার এবং
স্নান আর ভ্রমণের জায়গা…

চন্দ্রহীন রাত্রির নৈশব্দ্যে মশালের আলোয় সেই উল্লাস আর
বাঁধ কেটে দেওয়া নদীর জলোচ্ছ্বাসে
ভেঙে যাওয়া ঘুমের স্মৃতি
ঘুরে বেড়ায় একেকদিন—
আমি নিদ্রার মধ্যে অকস্মাৎ স্পর্শ করি যুযুধু দুটি বৃষের
প্রস্তরীভূত শৃঙ্গ
অন্বেষণে গিয়ে কুড়িয়ে পাই নারীদের ব্যবহৃত
অলংকার—
এবং কুড়িয়ে পাই আক্রান্তদের কান্নার শিলীভূত কিছু ভাষা
অথবা অক্ষর—যার পাঠোদ্ধার
হয়নি অদ্যাবধি
এবং যার কংকাল একটু একটু করে—একটু একটু করে—রোজ
মিশে যাচ্ছে কালের সঙ্গে—।

সেইসব রাত্রে আমাদের সঙ্গে অনেক পোষা ময়ূর
পালিয়েছিল পাশের অরণ্যে
গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নার মধ্যে তাদের পায়ের চিহ্ন
হঠাৎ চোখে পড়ে দু' একটা
আমি সেই চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়ে গেছি অনেকদিন অনেকদূর
অথচ তাদের কাউকে কোনোদিন
দেখা যায়নি স্বপ্নের মধ্যেও—।

চৌমাথায়

এই মুহূর্তে একটা চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা
কোন্‌দিকে যাব ! কোন্‌দিক কার !!
পুবদিক অধিকার করেছে উদয়
পশ্চিমকে পূর্ণ করেছে অস্ত
উত্তর আর দক্ষিণ তো দুই মেরুর···
আমরা কোন্‌দিকে যাব ! কোন্‌দিক কার·····!!
আমরা প্রত্যহ এসে দাঁড়াই এক চৌমাথায়
আমরা অনেক—আমরা অসংখ্য
নিশ্চিত জানি না কার মুখ ঘুরে যাবে কোনদিকে
সব দিকেই তো আছে কেউ না কেউ
কে কোন্‌দিকে মুখ করে পা ফেলব এখন !

যদিও

গ্রীষ্মে ঠিক গ্রীষ্ম আসে না আজকাল বর্ষাতেও আসে না বর্ষা
তবুও আদি বৃত্ত থেকে পরপর ছড়িয়ে যেতে থাকে বৃত্তগুলো
আসক্তি কমে না একটুও বরং বেড়ে যায় আসক্তি
বিমূর্ত পায় অবয়ব চমৎকার প্রক্রিয়ায়, তবু
মাঘেও আসে না বাঘের গায়ে লাগার মতো শীত
ফাল্গুনে আসে না ফাল্গুনের মতো বসন্ত।

ধনুকে গুণ লাগায় আর খুলে ফেলে—ব্যাধ
ভুলে যেতে থাকে তীরবিদ্ধ করার কলাকৌশল—যখন তখন
জালের মধ্যে তেমন শিকার পড়ে না আজকাল
মুখোশও চিনে ফেলে পক্ষীরা—
আড়ম্বর জমে ওঠে হঠাৎ-হঠাৎ (অথচ তা কোনো উৎসব নয়।)
উৎসবে ঠিক উৎসব হয় না আজকাল আর
ঋতু আসে না ঋতুর মরশুমে
তবু বৃত্ত থেকে বৃত্ত পার হয় পংখীরাজ কেননা
আসক্তি কমে না একটুও (বরং বেড়ে যায় আসক্তি)
এবং বিমূর্তকে দিই অবয়ব যদিও
ধনুকের গুণ কেবল খুলে খুলে যায়—কেবল খুলে খুলে যায়·····

জানলা খুললে

জানলা খুললে
চোখে পড়ত ম্যাগনোলিয়া মেঘ
তৃপ্তি-আকাশে ডোবা গা। দিনান্তের অশ্রুসজল সূর্য
বিকেলের বেলা-যায়-যায় মনের হাত থেকে
খসে পড়েছে নদীর জলে।
জলে ডোবা মানুষের মতই বার বার মাথা তুলে
উত্তীর্ণ হতে চাইছে ঢেউয়ের গম্বুজে।

চোখ পড়ত
অন্ধকারকে ছড়িয়ে দেবে বলে
স্নায়ুযুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়ানো মেহগনি বন।

জানলা খুললে
মর্চে ধরা কব্জার কঁকিয়ে কাঁদার শব্দে
রজনী গন্ধার পাপড়ি ছিঁড়ে আকাশ হত শুরু ;
চোখে পড়ত
নারকল কুঞ্জে ম্যাগনোলিয়া মেঘ
চন্দনের টিপ হয়ে জ্বলছে
জানলা খুললে চোখে পড়ত·····

শব্দগুলো

ভালোবাসার মধ্যে তুমি, তোমার মধ্যে ভালোবাসা—
এভাবেও ভালোবাসা প্রমাণ হোল না।
তোমার খবর পাব সুনিশ্চিত, এই প্রত্যাশায়
শব্দ সংগ্রহে আমি ব্রতী হয়েছিলাম ;
কিন্তু তার আগেই 'ভালোবাসা' বাতিল হয়ে গেল।
তবু তুমি সপ্রতিভ হেঁটে গেলে
চৌরাস্তার মোড়ে দারুণ জীবন্ত লাগে সবুজ সঙ্কেত।

তোমার রাস্তায় কঙ্কালীতলার বুনোফুল
কে তোমার উপাস্য বিগ্রহ, তুমি কার দেবদাসী ?
আমি সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে,
শব্দগুলো মাথা নুইয়ে মনোস্কামনা জানায়
অহর্নিশ।

পদচিহ্ন ধুয়ে যায়

সারাদিন টো টো ঘুরে এইমাত্র বসেছি ছায়ায়
পাতাল অনেক নিচে।
চারিদিকে এখন পাতাল।
হয়তো কোথাও যাব এমন ছিল না ঠিক
তাই টো টো ঘোরা।

আসলে দুঃখের কথা আমাকে ভুলিয়ে
ঘর থেকে পথে টেনে আনে
আসলে সুখের কথা আমাকে ভুলিয়ে
ঘর থেকে পথে টেনে আনে
যখনি হারাই পথ নিজেকে গোপনে—
পদচিহ্ন রেখে দিয়ে জলের কিনারে—
ডোবাই পাতালে।

দুঃখের সমস্ত রাত্রি ঝরে গেলে নীল স্রোতে
কেউ তা জানে না,
সুখের সমস্ত দিন নীল স্রোতে রাত হোলে
কেউ তা জানে না।
আমি জানি
সুখের মুনিয়াগুলি খাঁচা খুলে উড়ে গেলে মধ্যাহ্নের রোদে
দুঃখের সমস্ত রাত্রি থাবা তুলে বুকের নিভৃতে ;
বলে, 'পদচিহ্ন ধুয়ে যায় জলে
তুমি তা জানো না।'

কবিতা

যাত্রাপথ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটু আধটু বিপদ ছিল পথের মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো
তার মধ্যে যাত্রা এবং তিন আঙুলে অনেক দিনের ব্যথা
পকেট ভরা নাম ঠিকানা, এবং তারা সবাই সদ্য মৃত
তবু কোথাও যেতে হবে, বেলা শেষের আগেই যাওয়ার কথা।

যেদিন খুব তাড়া আমার, সেদিনই হুড়মুড়িয়ে নামে
অকাল মেঘ চমকে দেয় সারা আকাশ, বৃষ্টি আসে হামলে
সামনে হঠাৎ গজিয়ে উঠলো পাহাড়, নাকি ভুঁইফোঁড় গাছপালা
চতুর্দিকে শিসের শব্দ, চতুর্দিকে ভয়ের শব্দ, অশরীরীর শ্বাস!

এই রকমই হবার কথা, কোনোদিনই তো ঠিক পথ বাছিনি
যে-জল আমার বিষম চেনা, ডুব দিইনি কখনো সেই জলে
যেমনভাবে হারিয়ে যাবার কথা ছিল, তেমনভাবে হারানোও তো হলো না
বিশ্বাসের কণ্ঠ ছিল, ভালোবাসায় ভুল ছিল কি ? ভালোবাসাই গেল নির্বাসনে।

ম্যাজিক

দিব্যেন্দু পালিত

ম্যাজিকঅলার দু'টি হাত ও
দু'টি পা।
তার সঙ্গীর
নরম গা।

সঙ্গী না, সে সাঁঝনী—
ঠাটঠমকে রঙ্গিনী।
ডুগডুগিতে হাত বাজিয়ে
চেঁচিয়ে বলে, তফাৎ যা!

লোকটি তখন শাহান শা।
করাত দিয়ে অর্ধ করে
তার সঙ্গীর নরম গা।
দু'হাত তুলে দু' পা নাচায়—
লোকচক্ষু চমকে চ্যাঁচায়,
কেমন শরীর, রক্ত নেই।

সঙ্গিনীটি লজ্জা পেয়ে
দাঁড়ায় উঠে ভিরমি খেয়ে ;
বলে সবার চক্ষে চেয়ে.
রক্ত ? নাকি মৃত্যু নেই ?

ক্ষণকাল-চিরকাল

পলাশ মিত্র

প্রত্যেকেই এক-এক মুহূর্তে অসহায় ঃ
প্রত্যেকেই এক-এক মুহূর্তে কেঁদে ওঠে।
অসহায় শিশুর মতো
ভয়ে কিংবা বিস্ময়ে
প্রত্যেকেই এক-একবার দিশেহারা।

আমি জীর্ণ পাতাগুলি কুড়োতে থাকি।
সবুজ কিশলয়ের গায়ে হাত রেখে
বিবর্ণ পাতাগুলি আরো গভীরভাবে চেপে ধরি।

আমি কালো এবং নীল মেঘের মাঝখানে
এইবারে দাঁড়াতে চাই।

ভাঙছে
ভেঙে যায় মধ্যপুরুষ
মধ্যপুরুষের খোলামকুচি
যৌথ গ্যালারির
প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্প না

পাখিরা আছেই হ্যাঁ ফুলেরা থাকে
অস্বীকার করা ধমনীতে
ধ্বস্ত খড়কুটো আর সে-ভাঙাডালে
গৃহশত্রু
পাখি ও ফুল থাকে
যৌথ গ্যালারির
স্বেচ্ছা-পুনরুদ্বোধক ঐ
পাখিরা ফুলেরাও পারে না
নিজেদের লুপ্ত করতে
মধ্যপুরুষের খোলামকুচি
যৌথ গ্যালারির শিল্প না

জলের টানে জল
অশ্রু অশ্রুতে ফেরায় কে
পিতাকে পুত্রের মহান স্থলভূমি
ফিরিয়ে কে দ্যায়
কবিতা জানে না তা যুদ্ধ জানে
তৃতীয় যুদ্ধের হাহাকার
যৌথ গ্যালারির
স্বেচ্ছা-পুনরুদ্বোধক ঐ
তবেই হাহাকার বুকে আয়

ভুলে থাকা

মণীন্দ্র ঘটক

বৃষ্টি হয়ে যায়
তারপরে তুমি তারাগুলোকে আঁচল থেকে খুলে
ঠিক ঠিক জায়গামত বসিয়ে দিয়েছ
চাঁদটাকে একটু বাঁকা করে লাগিয়েছ মাথার ওপরে
বুকের ভেতর থেকে হাওয়া ছেড়েছ
আমার জানালার পর্দা ফুলে ফেঁপে উড়ছে
চারিদিকে রাত গভীর।

আজকাল প্রায়শই ভুল হয়।
সন্ধ্যায় অমন মেঘের গুমোট দেখেও
মনে হয়নি বৃষ্টি হবেই।
আগে আগে এমন দেখলে পথে নেমে যেতুম।
ভিজতুম, তুমি হা হা করে তাড়া লাগাতে।

এখন তোমারও ভুল হয়।
কেমন সব ধুয়ে মুছে পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেল
যেখানকার যা সেখানে তা নির্ভুল।
স্বভাবের বাইরে আর মন চায় না।
ঘরে-বাইরে এক বিরাট রাত্রি বিরাট দিন
তাকে তুমি কেবল সাজাচ্ছ।

আজকাল এ রকম ভুলে থাকা দেখি।

এই মেঘ

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নানা রংয়ের এক বিশাল মেঘ উঠেছে আকাশে
যেন এক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মানুষ তৈরী করছে মাটির পথ ;
সেই পথের পাশে এখানে-ওখানে রক্তের ছিঁটের মতো
ফুটে আছে ফুল ; আর এক ঝাঁক পাখি
মাতিয়ে তুলেছে তাকে।

আকাশ ছিল ধূসর, স্তব্ধ, শূন্য, অগাধ ;
সারারাত সেখান থেকে শিশির ঝরতো চোখের জলের মতো ;
আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম ; আর দুর্বল চাঁদ
আমাদের দেহের উপর থিতিয়ে দিতো জ্যোৎস্নার সর।

কিন্তু পুব দেশের সূর্য একদিন মাঠে নামলো মানুষের
কাঁধে ভর করে ; আর সেই দিনগুলোয় এক নোতুন
শস্যের জন্ম হলো ; ওই মানুষগুলো
চিরদিনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে জীবনের সঙ্গে
মিশিয়ে দিল দর্শন। তখন পৃথিবীর গা-বেয়ে
লক্ষ লক্ষ চিন্তার পাখি ছেয়ে ফেলল সারাটা আকাশ।

আজ আমার নিজের মেঘে তার গভীর অবয়ব
অথচ আমি যেন এক অভিজাত গ্রন্থাগারে
বসে আছি : আমার পাঠ শেষ হতে লাগবে এক যুগ
আরো ; তারপর আমি সেই জ্ঞানের বোঝা নিয়ে
জীবনের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে বলবো ঃ
ব্যর্থ হয়ে গেল জীবনটা !

বুকের আগুনে সূর্য

বাদল ভট্টাচার্য

উদাত্ত আকাশ জুড়ে
সূর্য চিরদিন স্বমহিমায় ভাস্বর ঃ
উজ্জ্বল আলোক বন্যায় অন্ধকার বিদীর্ণ করে
সত্য একদিন প্রকাশিত হবে চিরন্তন সততায় ;
কোন কুটিল মন্ত্রে
তুমি তাকে আটকাতে পার না,
ফেরাতে পার না পৃথিবীর ঋজু আবর্তন।

দূরের পাহাড়ীয়া নদী উত্তীর্ণ কৈশোরে
যেমন সমতল ডিঙিয়ে যায়,
ঠিক তেমনি সব কিছুই
একদিন চরম সার্থকতার গভীরে পৌঁছে যাবে।
মাটির গভীরে ভালোবাসা—
জলের টানে সুখ,
জীবনের এইসব শাশ্বত ঐশ্বর্য
তুমি কি করে উল্টো বাঁকে ফিরিয়ে দেবে ?
আটকে রাখবে শিকড়-বাকড়ে জড়িয়ে থাকা
সরল স্বচ্ছন্দ জীবন !
ঘরের ভেতর ঘর বেঁধে নিপুণ চাতুর্যে
তুমি নিজেকেই কেবল আগলাতে পার,
চতুর্দিকের খিল তুলে
আটকাতে পার সমূহ অন্ধকার—
ও অন্ধকারের আদিম মুখ ;
তাই বলে
বুকের আগুন আটকাতে পার না !

এমন বৃষ্টি

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন করে বৃষ্টি এসে ভেতরটা সব অগোছালো—
এমন করে বৃষ্টি এসে তোমার কথা মনে পড়লো—
এমন করে বৃষ্টি এসে জলের নীচে গাছের শেকড়—
এমন করে বৃষ্টি এসে ধুলোয় ঢাকা ছবির ওপর—
এমন করে বৃষ্টি এসে পিওন চিঠি আনল ঘরে—
এমন করে বৃষ্টি এসে কণ্ঠ দিলো অগোচরে—
এমন করে বৃষ্টি এসে তোমার শরীর গন্ধ বকুল—
এমন করে বৃষ্টি এসে এখন আমার সব কাজে ভুল—
এমন করে বৃষ্টি এসে সবই কেন এলোমেলো—
এমন করে বৃষ্টি এসে তোমার কথা মনে করালো।

গোলাপের অভিধান নেই

ব্রততী বিশ্বাস

গোলাপের কোনো অভিধান নেই জেনে সখ্যতা শ্রেয়
এই ভেবে কাঁটায় তুলেছি সুখ
প্রতিবেশীর বাগানের রোদ
নিয়েছি তস্করের মতো
কিশোরী চোখের শিশির
উজাড় হয়েছে প্রীতি উপহার
বিপুল পৃথিবী অবিরাম সত্য নিয়ে
টলমল পায়ের নীচে
অভিধান বহির্ভূত রাজপথে শঠতা নেই
এই জেনে অনেকদূর যাবো।
গুপ্তঘাতকের অদৃশ্য ছায়া নিরন্ত্র মুহ্যমান শোক
আমি কাঁটায় তুলেছি সুখ
অভিধানহীন গোলাপের বন্ধুতায় চিনেছি গোপন বসতি।

কোথায় তোমার সেই সত্যবন্ধ ধ্যানের আসন
কবিতা—
কোথায় তোমার সেই রক্তাক্ত প্রবল উত্থান ?

ইদানীং কবিরা তোমাকে বড্ড মিথ্যে বলাচ্ছে
তোমাকে দখল করেছে বড় মিহি নিপুণ ভন্ডামী
যেন হৃৎপিন্ডহীন খড়ের কাঠামো
যেন বা ধড়িবাজ কবির সেবাদাসী !
এ কি সম্মোহন ? এ কি আত্মবিস্মরণ ?
কবিতা—
জবাকুসুমসঙ্কাশের মতো তোমার সেই দীপ্ত অহংকার
মনে পড়ে ?
মনে পড়ে তোমার হাতের সেই দুরন্ত কার্তুজ ?

ফলত তোমাকে নিয়ে হল্লা করে বিলাসী বাবুরা
গোলাপের তোড়া ছোঁড়ে মেদবহুল সৌখীন রমণী
আর তুমি শব্দ কর, শব্দ কর
বন্দী তোতার মতো নিরেট বমনে !
কবিতা—
কোথায় তোমার সেই সত্যবন্ধ ধ্যানের আসন
কোথায় তোমার সেই রক্তাক্ত তীব্র উচ্চারণ ?